রাজকন্যার স্বয়ম্বর

মনোজ বসু

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৮

প্রকাশক —ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক —রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট ও ছবি
—সুবোধ দাশগুপ্ত

গ্রন্থক—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা পঁচাত্তর ন. প.

নতুন কালের শক্তিমান কথাকার

শ্রীমান রমাপদ চৌধুরী

স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের

উপন্যাস

রাজকন্যার স্বয়ম্বর
রূপবতী
মানুষ নামক জন্তু
রক্তের বদলে রক্ত
মানুষ গড়ার কারিগর
আগস্ট, ১৯৪২
এক বিহঙ্গী
ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল
নবীন যাত্রা
বকুল
বাঁশের কেল্লা
বৃষ্টি, বৃষ্টি!
ভুলি নাই
শত্রুপক্ষের মেয়ে
সবুজ চিঠি
সৈনিক
আমার ফাঁসি হল
বন কেটে বসত

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম
ঐ ২য়
সোবিয়েতের দেশে দেশে
পথ চলি
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ

গল্প

মায়াকন্যা
গল্প-পঞ্চাশৎ
গল্প-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)
একদা নিশীথকালে
কাচের আকাশ
কিংশুক
কুঙ্কুম
খদ্যোত
দেবী কিশোরী
নরবাঁধ
পৃথিবী কাদের
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

ডম্বরু ডাক্তার
চম্বক
নূতন প্রভাত
প্লাবন
বিপর্যয়
বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং
রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন
ডাকবাংলো (দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্যায়িত)

॥ এক ॥

বিরাট অট্টালিকা। সদর মহল, অন্দর মহল। সোনাটিকারির রাজবাড়ি। সত্যি সত্যি রাজা উপাধি ছিল এঁদের এক পূর্বপুরুষ রামকুমার সোমের। রাজা রামকুমার সোম চৌধুরি। নবাব সরকারে কানুনগো ছিলেন তিনি, জরিপ করে লাখ দুই বিঘে জমি বের করে দিলেন। এত জমি জোতদারেরা বিনি খাজনায় ফাঁকি দিয়ে খেয়ে আসছিল। নবাব খুশি হয়ে গোটা সোনাটিকারি পরগনা রামকুমারকে বন্দোবস্ত দিয়ে দিলেন। আর রাজা বলে সনদ দিলেন।

জনপ্রবাদ এমনি। কেউ বলে সত্যি, কেউ বলে মিথ্যে। বলে, ঘুঘুলোক ছিলেন রামকুমার। নাজিরের সঙ্গে যোগসাজসে সোনাটিকারি গ্রাস করেছিলেন আসল মালিককে বঞ্চনা করে। রাজা উপাধিও ভুয়ো—ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে নামের আগে জোর করে তিনি রাজা লিখতে লাগলেন। নবাব-সরকারে অভিযোগ উঠল। রামকুমার বললেন, নামই আমার রাজা-রাম, পুরো নামটা সংক্ষেপ করে এ তাবৎ রাম বলতাম। এর উপর বলবার কিছু নেই। ডঙ্কা মেরে সারাজীবন রামকুমার নামের আগে রাজা চালিয়ে গেলেন।

সে যাই হোক, তিন বিঘের উপর বিশাল অট্টালিকা আকাশ জুড়ে সেই আমল থেকে দাঁড়িয়ে। অহরহ মানুষজনে গমগম করত। এখন দিনকাল ভিন্ন। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে লোকে নানান রকমে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। রাজবাড়ির অন্য শরিকরা সময় থাকতে জমি-জমা বিক্রি করে সরে পড়েছেন। আছেন মেজরাজা অশ্বিনীকুমার। পরগনার দেড়আনা হিস্যার মালিক তিনি। অতবড় বাড়িখানার ভিতরে তাঁরা কয়েকটি মাত্র প্রাণী—তা বলে মেজরাজার দৃক্‌পাত

নেই। রীতিমত ডাকহাঁক করেই আছেন। এতখানি বয়সের মধ্যে অঞ্চলের বাইরে যান নি বড় একটা। যাবেনও না জন্মস্থান ছেড়ে, গোঁ ধরে আছেন। এখন বাড়ির মধ্যে একলা একটি পরিবার। কিন্তু সমস্ত মানুষ চলে গিয়ে সোনাটিকারি গাঁয়ের ভিতরেও যদি একলা হন, তবুও নড়বেন না দেহের ভিতরে জীবন থাকতে।

এক ছেলে আর এক মেয়ে রেখে স্ত্রী গত হলেন। বাঁশি ছ' মাসের তখন। ছেলে আশিস বাঁশির বছর পাঁচেকের বড়। বিধবা বড় বোন বিরজা এই সময়ে সংসারে এসে ছেলে-মেয়ের ভার নিলেন। রক্ষা পেলেন মেজরাজা, তাঁকে আর বিয়ে-থাওয়ার ঝামেলায় যেতে হল না। ছোট্ট সংসার—ঐ চারটি প্রাণীর। রাজবাড়ির উপর তলায় নিচের তলায় পনের-বিশখানা ঘর—মাঠের মতন এক-একখানার আয়তন, আকাশের মতন উঁচু ছাত। মোটা মোটা থাম রাতদিনের পাহারাদারের মতো অলিন্দ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চারটি ছোটখাট মানুষ এর ভিতরে যেন নজরে আসে না।

পালানোর হিড়িক পড়েছে। আর তিনজনে ছটফট করছে, কিন্তু অশ্বিনী অবিচল: চিরকাল মানইজ্জত নিয়ে কাটিয়ে বুড়ো-বয়সে এখন কোন্ ভাগাড়ে মরতে যাব? যেতে হয়, তোমরা সব চলে যাও। আমি থাকব, আর—

মেজরাজার দাবার নেশা। খেলার সঙ্গী হাই-ইস্কুলের ভূতপূর্ব সেকেণ্ড-মাস্টার সদাশিব বাঁড়ুয্যে। তাঁকে দেখিয়ে বলেন, আমি থাকব আর থাকবে আমার শিব-দাদা। দু'জনে মজা করে রাঁধব বাড়ব খাব, দাবা খেলব, সন্ধ্যা দেব বাপ-পিতামহের জায়গায়। আমার কি!

সদাশিবেরও খুব সায়: গাঁখানা আমার সাজানো বাগান। একফোঁটা বয়স থেকে শুধু এই গাঁ নিয়ে আছি। একলা মানুষ, কে আমার কি করবে? গাঁ ছাড়লে দুটো দিনও বাইরে গিয়ে বাঁচব না মেজরাজা।

দাবা খেলছেন কতকাল, তার লেখাজোখা নেই। বাঁশি তখন একেবারে ছোট, বয়স দুই কি আড়াই বছর—সেই সময়ের একটা দিনের কথা ধক করে সদাশিবের মনে পড়ে গেল। বজ্জাতি মেয়ের সেই বয়স থেকেই। সদাশিব আলাদা নামে ডাকেন বাঁশিকে—কাঞ্চনবরণী। থপথপ করে বাঁশি খেলার জায়গায় এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই আছে। নিপাট ভালমানুষ, কিছুই যেন জানে না। মুখ তুলে সদাশিব হেসে একবার বললেন, হুঁ, দেখে দেখে খেলাটা শিখে নাও দিকি কাঞ্চনবরণী। বুড়ো হয়ে গেলাম—কবে আছি, কবে নেই। আমি গেলে মেজরাজার অনুপায়। খেলুড়ে পাবে না, দিন কাটবে কি করে ?

মেজরাজা তখন তামাক টানতে টানতে নিবিষ্ট হয়ে চাল ভাবছেন। বড় বিপাকে ফেলেছেন সদাশিব। বাঁশি হঠাৎ ডাকাতের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে কোর্টের উপরের ঘুঁটি হাণ্ডুলপাণ্ডুল করে দিল।

সদাশিব রে-রে করে ওঠেন : দেখ, তোমার আহ্লাদে মেয়ের কাণ্ডখানা দেখ মেজরাজা।

অশ্বিনী চটেমটে বলেন, দাঁড়াও, বড্ড বাড়িয়েছ তুমি। মজা দেখাচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব, কোনদিন আর ঘুঁটিতে হাত ঠেকাতে আসবে না।

প্রকাণ্ড চড় উঁচিয়েছেন। সদাশিবের সঙ্গে চোখোচোখি হতে হেসে ফেললেন। চড় না মেরে কোলে টেনে নিলেন বাঁশিকে।

সদাশিব বলেন, সে আমি জানি। কাঞ্চনবরণীও বোঝে সেটা। তাই অত প্রতাপ।

মেজরাজা তম্বি করেন : পারিনে মারতে ? তবে দেখ।

চড় তুলেছিলেন, আদর করে সেই হাতে বাঁশির গাল টিপে দেন।

সদাশিব বলে ওঠেন, কি কর, কি কর! আহা, অনেক তো হল। একফোঁটা মেয়ে এত মার কী করে সইবে ?

আবার অন্য সুরে বলেন, মারবেই বা কেন শুনি ? কাঞ্চনবরণী

তোমার উপকারই করে দিল। আর পাঁচ-সাত চালে মাত হয়ে যেতে। সাদাসিধে মাত নয়, অশ্বচক্র করে ছাড়তাম। ঘোড়ার চালে চালে তোমার রাজা সারারাত চক্কোর দিয়ে বেড়াত।

মেজরাজা বলেন, বেশ, সাজিয়ে নাও ফের। কার ঘুঁটি কোথায় ছিল সব আমার মনে আছে। মাত কে কাকে করে, দেখা যাক।

সাজাতে গিয়ে দেখা যায় লাল ঘুঁটি দু-তিনটে বাঁশির দু-হাতের মুঠোয়। দেবে না কিছুতে। তখন খোশামুদি করতে হয়: আচ্ছা, তুমি সাজিয়ে দাও বাঁশি। বাঁশির মত কেউ পারে না। আমাদের চেয়ে ভাল পারে বাঁশি।

খোশামুদিতে দেবতাগোঁসাই অবধি গলে জান, বাঁশি আর কী! মনের আহ্লাদে সে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। রাজার জায়গায় বড়ে, রাজা গেলেন ঘোড়ার জায়গায়। বাঁশি একেবারে বিধাতাপুরুষ হয়ে যাকে যেখানে খুশি বসিয়ে দিচ্ছে।

সদাশিব বলেন, খাসা হয়েছে। যাও তুমি এইবারে, আমরা একটু সরিয়ে ঘুরিয়ে নি।

কিন্তু যতবার ঘুঁটি নিজ স্থানে নিয়ে আসেন, জেদি মেয়ে উল্টোপাল্টা করে দেয়। সহসা দার্শনিক তত্ত্ব সদাশিবের মনে ভেসে আসে। বলেও ফেলেন মুখে: দেখ, শিশু হল ভগবান—ত্রিকালদর্শী। যা ভবিতব্য, তাই বলে দিচ্ছে। রাজা-প্রজা সব একাকার হয়ে যাবে, এর জায়গায় ও, তার জায়গায় সে। ঘুঁটির গোলমাল করে শিশু সেই কথা আগেভাগে বলে দিল।

মেজরাজা নিশ্বাস ফেললেন। খেলার মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে যেমন হঠাৎ। বলেন, দেরি বেশি নেই সেদিনের। ঝড়ের বেগে আসছে। রাজবাড়ির মেজরাজাকে সকাল-সন্ধ্যা কাছারি-দালানে ইদানীং নিজে গিয়ে বসতে হচ্ছে। ঠাটটুকু কোন রকমে বজায় রেখে প্রজাদের কেবল পায়ে ধরতে বাকি রাখি। খাজনাকড়ি ঠিক মতো উশুল হলে

তবে উনুনে হাঁড়ি উঠবে। নয় তো রাজপুত্র-রাজকন্যা মন্ত্রী-কোটাল সবসুদ্ধ পাইকারি উপোস। রাজার যে চাকরিবাকরি করতে নেই, চাকরির বিদ্যেবুদ্ধিও নেই। কোন একটা উপায় থাকলে, সত্যি বলছি শিব-দাদা, কবে এদ্দিন রাজ্যপাট ছেড়ে পালাতাম।

সতের-আঠার বছর আগেকার কথাবার্তা। কী হয়ে গেল তারপর। নিরালা রাজবাড়ি প্রেতভূমির মতো। বাড়ির বাইরে সমস্ত সোনাটিকারি ও আর দশটা গ্রাম জুড়ে কখন কি ঘটে, এমনি ভয়ে বিহ্বল মানুষের দল। মুখে সেদিন যত বলাবলি করুন, এতখানি সর্বনাশ কেউ ভাবতে পারেন নি।

॥ দুই ॥

রাজবাড়ির ভিতরে আরও একজন আছেন—হরিবিলাস ঘোষ। রাজ-এস্টেটের পুরানো খাজাঞ্চি। রাজবাড়ির ঘেরের মধ্যে কর্মচারীদের কোয়ার্টার। দু'খানা তিনখানা করে বসতঘর এবং রান্নাঘর ইত্যাদি। এমনি চারটে কোয়ার্টার পাশাপাশি। ম্যানেজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদর-নায়েব ও খাজাঞ্চি থাকতেন। এখন সম্পত্তির সাড়ে-চৌদ্দআনা বেহাত হয়ে গেছে। চারজন বাঘা-বাঘা কর্মচারী বিশ-পঁচিশজন আমলা নিয়ে সামাল দিয়ে পারতেন না—সমস্ত গিয়ে একমাত্র হরিবিলাসে ঠেকেছে। একাধারে তিনি ম্যানেজার নায়েব ও খাজাঞ্চি। তা-ও কাজ খুঁজে পান না। পুরানো অভ্যাস মতো অশ্বিনীকে অতিশয় সমীহ করেন। পারতপক্ষে মেজরাজার মুখোমুখি হতে চান না। প্রাণের কথা যা-কিছু সদাশিবের সঙ্গে। এক এক সময় সদাশিবকে বলেন, চিরকেলে খাটনির মানুষ, শুয়ে বসে বাত ধরে যাবার যোগাড় মাস্টারমশায়। ভাবি, যাই চলে কলকাতায়, ছেলের কাজ-কারবারে লেগে পড়িগে। ছেলেও তাই বারম্বার লিখছে।

একা মানুষ, তবু মস্তবড় বাসা ভাড়া করে আছে। মাকে নিয়ে তুলবে সেই বাসায়, খুব বড় ডাক্তার দেখাবে। কিন্তু বলুন মাস্টারমশায়, রুগিকে এই অবস্থায় ঠাঁইনাড়া করা কি উচিত? তার উপরে আমারও ঠিক মেজরাজার মতন—নতুন জায়গায় গিয়ে উঠতে সাহস পাই নে। হোক কলকাতা শহর—জায়গা নতুন তো বটে। বলে, হাজার রকমের সুবিধে শহরে। তবু আমাদের সোনাটিকারিই ভাল। কি বলেন মাস্টারমশায়?

হরিবিলাসের ছেলের নাম বিনয়। তিন-তিনবার ইস্কুল-ফাইনালে ফেল হল। সদাশিবের ইস্কুলের ছাত্র। গাঁয়ের সকলে হ্যাক-থু করে বিনয়কে। মূর্খস্য মূর্খ। এই সদাশিব মাস্টারমশায়ই কতবার বলেছেন। নিঃসহায় একদিন সে বেরিয়ে পড়ল। মনের ঘেন্নায় বলা যেতে পারে। সেই বিনয় শহরে গিয়ে এত চালাকচতুর হয়ে উঠবে, এমন জমিয়ে বসবে, কে ভাবতে পেরেছে। মায়ের অসুখ শুনে মাস দুই আগে একবার সে এসেছিল। ছিল গোনাগুনতি মাত্র দুটো দিন। বেশি থাকবার উপায় নেই, সে দিকে তা হলে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। হরিবিলাস যা বললেন—এলাহী কাণ্ডকারখানা। মস্তবড় ছাপাখানা করেছে, ত্রিশ-চল্লিশটা মানুষ খাটে। হুড়ুম-হাড়াম মেশিন চলছে সমস্ত দিন—কখনো বা রাত দুপুর অবধি। মায়ের জন্য একগাদা ফল নিয়ে এসেছিল বিনয়। আর কোটো কোটো রকমারি বিলাতি পথ্য। যে দু-দিন ছিল, দু-হাতে খরচপত্র করে চলে গেল।

অথচ তিরিশ বছরের মাস্টারিতে বিনয়ের মতো অঘা ছেলে দেখেন নি সদাশিব। তখন বিনয় ক্লাস এইটে পড়ে। হেলাফেলার ক্লাস নয়, আর তিনটে বছর পরেই ধর ফাইনালে গিয়ে বসতে হবে। সদাশিবকে সেকেণ্ড-মাস্টারি থেকে নামিয়ে দিয়েছে, তবু তখনো এসিস্টান্ট-টিচার হয়ে আছেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ আগেকার দিনের

মতোই। ছেলেরা কাছ ঘেঁষে না। তিনি আসছেন দেখতে পেলে ঝোপঝাড় অপথ-কুপথ ভেঙে পালাবে।

ক্লাস এইটের ছেলে বিনয় একদিন কাঁচামিঠে আমের লোভে দৈববুড়ির গাছে উঠে পড়েছে। দৈবসুন্দরী চোখে ঠাহর করতে পারেন না, ধরিয়ে দিল মেজরাজার মেয়ে বাঁশি। মেয়ে একটা বটে—বাঁশি না হয়ে বিচ্ছু কেন ওর নাম হল না। বিনয়ের চিরশত্রু বাঁশি। দৈব ক্যারক্যার করছেন, বিনয় কানেও নেয় না। তখন বাঁশিই বুড়ির কানে কানে বাতলে দিল: মাস্টারমশায় যাচ্ছেন ঠাকুমা, ওঁকে ডাক দাও।

সদাশিব গাছতলায় এসে শান্ত স্বরে বললেন, নেমে আয়—

উঠে পড়েছিল সেই একেবারে মগডালে, এডাল-ওডাল করে নামছে। বাঁশি একছুটে গিয়ে একগাছা ফুলো-কঞ্চি এনে সদাশিবের হাতে দিল। শয়তানি বুদ্ধির হাঁড়ি মেয়েটা। বাঁশির দিকে এক নজরে তাকিয়ে সদাশিব অস্ত্রটা নিয়ে নিলেন। ফুলো-কঞ্চি দেখে শম্বুকের গতি হল বিনয়ের।

উপরের দিকে তাকিয়ে সদাশিব হুঙ্কার দিলেন: কই রে, তাড়াতাড়ি নেমে আয়।

একসময় অবশেষে নামতেই হল ভুঁয়ে। সদাশিব হাতের কঞ্চি আস্ফালন করছেন, অদূরে দাঁড়িয়ে বাঁশি তৃপ্তিভরে নিরীক্ষণ করছে। এইবার, এইবার! পুলকের আতিশয্যে পা দু-খানা নাচের মতন ওঠানামা করছে।

কিন্তু না মেরে সদাশিব প্রশ্ন করলেন: 'পরাকাষ্ঠা' মানে কি?

ঘা কতক কঞ্চির বাড়িতে কী আর হত। এই শাস্তি অধিক গুরুতর। বিশেষ করে মহাশত্রু ঐ বাঁশির চোখের উপরে।

কী হল, মুখের বাক্যি হরে গেল যে!

কম্পমান কণ্ঠে বিনয় বলে, 'পরাকাষ্ঠা' মাস্টারমশায়? 'প'-এ আ-কার—

বানান চাই নে, মানে—

একটুখানি ভেবে বিনয় বলে, পরের কাঠ—

যা শঙ্কা করা গিয়েছিল—বাঁশি হাসিতে ফেটে চৌচির। দৈববুড়ি কী বোঝেন—তবু অন্য মানুষ না পেয়ে বাঁশি তাঁকেই সালিশ ধরে : শুনলে তো ঠাকুমা ? 'পরাকাষ্ঠা' মানে পরের কাঠ—হি-হি-হি—

বিনয় গরম হয়ে বলে, তুই পারিস ?

অন্য ব্যাপারে যাই হোক, এটা পারবে বাঁশি। নির্ভুল বলতে পারবে। কথাটা তারই বইয়ের। সদাশিব সকালবেলা বাঁশিকে পড়িয়ে আসেন। আজকেই পাওয়া গেছে কথাটা। মাথার মধ্যে ঘুরছিল, বিনয়কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সেইটেই তাঁর মুখে এসে গেল।

জবাব দিয়ে বাঁশি সঙ্গে সঙ্গে ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছে : কান মলে দিই মাস্টারমশায় ? উঃ, যা লম্বা বিনয়দা, কান হাতেই পাওয়া যায় না।

সদাশিব চটে উঠলেন : কান মলতে তোকে কে বলল ?

আহত কণ্ঠে বাঁশি বলে, বাঃ রে, পেরেছি তো আমি।

তা বলে যে তোর বড়ভাইয়ের মতন—এক বাড়িতে থাকিস, বড়ভাই ছাড়া কি ?—হুট করে তার কান মলতে যাস, বজ্জাত কোথাকার !

সুযোগ পেলেই বাঁশি বিনয়ের পিছনে লাগবে। বিনয় বেকুব হলে তার আনন্দ। সাঁতারটা বাঁশি খুব ভাল পারে। জল কেটে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যায় উড়ন-তুবড়ির মতো তারা কাটতে কাটতে যেন। ঘাটে পড়ে বিনয় হয়তো তখন পা দাপাচ্ছে। তাই নিয়ে কী হাসাহাসি মেয়েটার—জলের মধ্যে থেকেও বিনয়ের গা জ্বালা করে।

একদিন তাই মরিয়া হয়ে খানিকটা দূর চলে গেল—গিয়ে আর সামলাতে পারে না। ডুবছে, ভেসে উঠছে। জলের উপরে হাত

করে কি বলছে যেন বাঁশির উদ্দেশে। বাঁশি জল থেকে ঘাটের উপর উঠে পড়েছে তখন, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর দু-হাত আড়াআড়ি রেখে নিঃশব্দে হাসছে। আর জল তোলপাড় করছে বিনয়। সত্যি সত্যি যখন তলিয়ে গেল, লাফ দিয়ে বাঁশি জলে পড়ে চক্ষের পলকে তাকে ধরে ফেলে।

বিনয়ের মা জ্ঞানদা সেইমাত্র ঘাটে এসেছেন। শরীর ভাল নয়, তবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন নি তখনো। ঐটুকু এক মেয়ে—চোখ মেলে দেখবার বস্তুই বটে—মেয়েটা কেমন অবহেলায় একখণ্ড শোলার মতন বিনয়কে ভাসিয়ে নিয়ে ঘাটের দিকে আসছে।

এত সমস্ত পলকের মধ্যে ঘটল। ঘাটে এলে সোয়াস্তি পেয়ে জ্ঞানদা ছেলেকে বকে উঠলেন : সাঁতার জানিস নে, কোন্ আক্কেলে অতদূর চলে যাস ?

বাঁশি তখন আবার বিনয়ের হয়ে ঝগড়া করে : তোমার অন্যায় কথা কাকিমা। ঘাটের রানা ধরে পা দাপিয়ে জলই ঘোলা হয় শুধু। সাঁতার শিখতে গেলে দূরে যেতে হয়।

জ্ঞানদা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, বিনয়ের প্রাণদান দিয়েছিস মা। তুই না থাকলে এক্ষুনি সর্বনাশ হয়ে যেত।

বিনয় সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। বলে, মরেই যাচ্ছিলাম মা, বাঁশিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তুমি আসছ দেখতে পেয়েই হয় তো—

বাঁশি বলে, না কাকিমা, মরবার কি হল ? দেখছিলাম, নিজে যদি আসতে পারে সাঁতরে। তা একটা পাতিহাঁস যা পারে, বিনয়-দা'র সে মুরোদটুকু নেই।

বিনয় অভিমানের সুরে বলে, ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে ফেললাম কতটা—

প্রবীণ অভিভাবকের মতো বাঁশি সান্ত্বনা দিচ্ছে : কী হয়েছে। পুকুরের জল—লোনা নয়, বিষাক্ত নয়। ডুববে এক-একবার,

জল খাবে, আবার ভেসে উঠবে। এমনি করেই তো শেখে মানুষে।

বলার ভঙ্গিতে জ্ঞানদার হাসি পেয়ে যায়। আভিকালের বুড়ি-ঠাকরুন। কত ছোট তখন, কাঁধের উপর থোপা থোপা চুল নাচিয়ে বেড়ায়—সেই তখন থেকেই পাকা পাকা কথা মেয়ের মুখে। ঝলকানো রূপ, বুদ্ধিও ক্ষুরধার। জ্ঞানদার শরীর দিনকে দিন খারাপ হয়ে পড়ছে—বেশি দিন বাঁচবেন না, অহরহ তাঁর মনে হয়। মরার আগে এমনি একটা ছোট্ট মেয়ে ঘরে আনতে পারতেন—হেসে খেলে ঝগড়াঝাঁটি করে ঘুরত চোখের উপরে। বাঁশির কথা হচ্ছে না অবশ্য। রাজবাড়ির মেয়ে, হরিবিলাস ঘোষ নিতান্তই পোষ্য প্রতিপাল্য যাঁদের। মনে মনে এমন কথা ভাবতে যাওয়াও পাগলামি।

ইস্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় বিনয় ফেল হল। বার বার দু-বার ফেল হয়ে পুনশ্চ দেবে। মরিয়া হয়ে লেগেছে—পাশ করবেই এই তৃতীয় বারে। একপ্রহর রাত থাকতে উঠে মুখস্থ করে, পড়ার চোটে পাড়াসুদ্ধ ঘুম ভেঙে যায়।

সেই কথা হচ্ছিল। মেজরাজা বলেন, যেমনধারা খাটছে, নির্ঘাত এবারে পাশ। ফার্স্ট ডিভিসনে যাবে।

সদাশিব ঘাড় নাড়েন : কচু! মাথার মধ্যে ওর ঘিলু নেই, গোবর। তিন বারে কেন, তিরিশ বার দিয়েও যদি পাশ করে হাতের তেলোয় রোঁয়া উঠবে আমার। কথাটা বললাম, এখন শুনে রাখ, পরিণামে মিলিয়ে দেখে নিও।

বাঁশি এই সময়টা এসে পড়ল। খাজাঞ্চির কোয়ার্টারের দিক থেকে আসছে। জ্ঞানদার কাছে প্রায়ই যায়। বড় আদরযত্ন করেন তিনি, এটা-ওটা খাওয়ান কাছে বসিয়ে।

বাঁশিকে দেখে সদাশিব বলেন, সত্যি সত্যি যার হবার ছিল তাকে তো সংসারের রাঁধাবাড়া কুটনো-কোটায় লাগিয়ে দিচ্ছ তোমরা।

বিরজা বলেন, ছ-মাস না পুরতে মা খেয়ে অবসর হল, সংসারের কতক কতক না দেখলে বুড়োমানুষ একলা আমি কত টানব? তারপর হেসে উঠে বলেন, তা ঐ দেখছ না, কত খাটনি খেটে বাড়ির গিন্নি বেলান্ত পরে এবারে বাড়ি ফিরলেন।

মেজরাজা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন: ছেলেটাই ইস্তফা দিয়ে বসে রইল, মেয়ে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে কি হবে?

কোলেপিঠে করে আশিসকে এত বড়টি করে তুলেছেন, তার নিন্দার কথায় বিরজা রক্ষা রাখেন না। ভাইয়ের উপর করকর করে ওঠেন: রাজবাড়ির কোন্ ছেলে কবে এল.এ, বি.এ. পাশ করে বিদ্বান হয়েছে শুনি? একটা পাশ দিয়েছে সেই ঢের। তোমার তো তা-ও হয় নি। তবে কি জন্য ছেলের কথা বলতে আস? বড়রাজার ছেলে যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছিল—ছেলের ঘেন্নাতেই ওরা তালুক বেচে দেশান্তরী হল। আর দিলীপের বউটা তো গলায় দড়ি দিয়ে বাঁচল—দারোগাকে ছ-শো টাকা খাইয়ে কেলেঙ্কারি চাপা দিয়ে দিল। আমার আশিসকে নিয়ে বলুক দেখি কেউ অমন একটা কথা!

সদাশিবও জোর গলায় বিরজার সঙ্গে সায় দেন: সত্যিকার ভাল ছেলে আশিস। লেখাপড়া না করুক, দশের কাজ করছে। তিলেক বিশ্রাম নেয় না। গ্রামসুদ্ধ সকলের বলভরসা ওইটুকু ছোকরা-মানুষের উপর।

কি ভেবে হাসেন মৃদু মৃদু। হাসতে হাসতে আবার বলেন, বলেছ ঠিক কথাই বিরজাদিদি। একটা পাশ করেছে, এ বাড়ির পক্ষে সেই তো অনেক। রাজপুত্র হয়ে অফিসের কেরানি হবে না, ইস্কুলের মাস্টারও হবে না। হয় যদি তো মিনিস্টার। তাতে বেশি লেখাপড়া লাগে না। ওই একটা পাশই হয়তো বা বেশি হয়ে গেছে। লাগে তার জন্য দশের কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়া—যে দশের ভোট কুড়িয়ে এসেম্বলি যাবে।

মেজরাজা বলেন, মিনিস্টার নয়, পরিণামটা হবে তোমারই মতন। সে আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি শিব-দাদা। তোমার ওই বয়সের কথা ভেবে দেখ। তুমি কি হয়ে জীবন কাটালে? কিন্তু সে কথা থাক। মেয়ের পড়া নিয়ে তুমি আর তাল লাগিও না। সেয়ানা হয়ে উঠেছে, দিনকাল ভাল নয়। গাঁয়ের এবাড়ি ওবাড়ি ধিতিং-ধিতিং করে বেড়ায়, এ-ও আমি পছন্দ করি নে। বিয়েথাওয়া দিয়ে পরঘরি করতে পারলে বাঁচি।

সদাশিব নিরস্ত হবার পাত্র নন: যদ্দিন বিয়েথাওয়া না হচ্ছে, ঘরে বসে পড়াশুনো করুক। ওই একটা পাশই করুক না, বেশি কে বলছে। আমি পড়াব। ঘাড়ে দায়িত্ব পড়লে মেয়ের পাড়ায় ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। বিয়েরও সুবিধা—সবাই আজকাল পাশ-করা মেয়ে খোঁজে। বাঁশি যা মেয়ে, একটু খাটলে ওর পাশ কেউ রুখতে পারবে না।

সদাশিবের জেদাজেদির কারণ আছে। গ্রামের হাই-ইস্কুল তিনিই একদিন গড়ে তোলেন। সদাশিব এবং তাঁর সমবয়সী ছেলে-ছোকরারা। মুরুব্বীরা মাথার উপর ছিলেন, কিছু কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তাঁরা খালাস। লোকের ঝাড়ের বাঁশ ক্ষেতের উলুখড় চেয়েচিন্তে এনে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে মাঠের মধ্যে বড় দোচালা ইস্কুলঘর তুলে দিলেন। গোড়ায় মাইনর-ইস্কুল—হতে হতে তারপর হাই-ইস্কুল। মাস্টার না জোটায় সদাশিবকেও একজন মাস্টার হতে হল। সেই প্রথম অবস্থায় মাইনেকড়ি কিছু নয়, ঘরের খেয়ে ঠিক দশটায় ইস্কুলে হাজিরা দিতে হত। একটাও পাশ করেন নি, সেইহেতু হেডমাস্টার এসিস্টান্ট-হেডমাস্টার না হয়ে সেকেণ্ড-মাস্টার। কিন্তু অঞ্চলের মানুষ জানে, হেডমাস্টারের কাজ শুধুমাত্র ক্লাসে পড়ানো—ইস্কুল বলতে সেকেণ্ড-মাস্টার সদাশিব বাঁড়ুয্যে।

সেই মাস্টারি চাকরি চলছে আজও। ইস্কুল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আইনকানুন, নতুন গভর্নিং-বডি। মেম্বার বাছাইয়ের জন্য ভোটাভুটি দস্তুরমতো। সদাশিব এখন সেকেণ্ড-মাস্টারও নন, জনৈক এসিস্টাণ্ট-টিচার। বিনা পাশের মানুষ বলে নব্য হেডমাস্টার তাঁকে ক্লাস ফোরের উপরে পাঠাতে ভরসা পান না। একেবারে না তাড়িয়ে নিচের মাস্টার করে রেখেছেন। এ-ও কত দিন চলবে, সন্দেহ আছে। সদাশিব তাই সর্বশেষ একবার দেখিয়ে দিতে চান, পড়ানোর ক্ষমতা আছে কিনা তাঁর। বাঁশি মেয়েটাকে পেলে পাশ করানোর সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না।

সদাশিবের কথায় বাঁশিও মেতে উঠল। সকাল-সন্ধ্যা দু'বার এসে সদাশিব পড়ান। বিনয়ের ধারণা, লেখাপড়ায় বাঁশির অমন উৎসাহ—সে কেবল বিনয় জব্দ হবে বলেই। বাঁশি পাশ করলে লোকে তুলনা করে দেখাবে: ছ্যা-ছ্যা, বেটাছেলে পেরে উঠল না একফোঁটা মেয়ের সঙ্গে।

সত্যি তাই হল, সদাশিবের কথা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল। বিনয় এবারও ফেল। এবং তারই বছর খানেক পরে বাঁশি পরীক্ষায় প্রথমবার বসেই ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেই থেকে লোকের সামনে বোরোয় না। বাড়িতে সর্বক্ষণ মুখ গুঁজে থাকে। তবু রক্ষে নেই, যখন তখন বাঁশি গিয়ে পড়ে: পরীক্ষা আরও দু-একবার দিলে পারতে বিনয়দা।

নিরুত্তরে ঘাড় গুঁজে আছে তো বাঁশি বিরক্তির সুরে বলে, না পড়বে তো কাকামশায়ের সঙ্গে কাছারি-দালানে গিয়ে বোসো কাল থেকে। কান-ফোঁড়া খাতা লিখতে লেগে যাও। লিখতে লিখতে হাতের অক্ষর ভাল হবে, পরিণামে খাজাঞ্চি হবে আমাদের।

হলই না হয় মনিবের মেয়ে, তা বলে ঘরের মধ্যে উঠে এমনি ট্যাঙস-ট্যাঙস শোনাবে! গ্রামছাড়া হয়ে তবে রেহাই। বিনয়ের

ছোটমামা কলকাতার মেসে থেকে চাকরি করেন, তাঁর কাছে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে একজনের ধরায় ছাপাখানার কাজ পেল একটা। আজ সেখানে হর্তাকর্তা-বিধাতা। যে ভদ্রলোকের ছাপাখানা, তাঁর নাম রঞ্জিত রায়। কলকাতার মানুষ রায় মশায়কে একডাকে চেনে। কাজের মানুষের বড় মর্যাদা রঞ্জিতের কাছে, বিনয়কে নাকি চোখে হারান তিনি।

হরিবিলাস জাঁক করে বলেন, পাশটা করে নি ভাগ্যিস। পাশ করে কি হত? আমার ছোট শালা গ্রাজুয়েট হয়ে ষাট টাকায় সারাদিন অফিসে কলম ঘষে। তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে বিনয় অমন বিশটা ষাট টাকার মানুষ পুষছে।

॥ তিন ॥

স্বাধীনতা নিয়ে ডামাডোল। পুলকে হৃৎকম্প সকলের। চারিদিকে পালানোর হিড়িক। এ ছাড়া কথা নেই মানুষের মুখে। কি হবে, উঠব গিয়ে কোথা?

হরিবিলাসের এসব ভাবনার অবসর নেই। জ্ঞানদার বাড়াবাড়ি অসুখ—সর্বক্ষণ সেই চিন্তা। অসহ্য যন্ত্রণা কাটা-কবুতরের মতন জ্ঞানদা ছটফট করেন বিছানায়, সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। বিনয় আসতে পারবে না, কাজের চাপ বড় বিষম। এসেই বা কি করবে, এক-আধ দিনে সারার ব্যাধি নয়। তবে চিঠি আসে প্রায় প্রতিদিনই। মায়ের জন্য বিনয়ের প্রাণ পড়ে আছে এই সোনাটিকারিতে।

পঁচিশ মাইল দূরে জেলার সদর, সেখানে নাম-করা বড়-ডাক্তার একজন আছেন। তাঁকে এনে দেখানো হল। অঢেল খরচ। কাঁচা-রাস্তায় ট্যাক্সি করে আনতে হল, টাকা চল্লিশের মতো গেল সেই বাবদে। ডাক্তারবাবুর ফী বত্রিশ, বলে-কয়ে পঁচিশে

রাজি করানো গেল। তার উপরে ওষুধপথ্যি ও আজেবাজে আর দশটা খরচা। প্রাণের বড় কিছু নেই—কথা সত্যি হলেও এত খরচা রাজাবাদশার পক্ষেই সম্ভব শুধু। তাই করছেন খাজাঞ্চি হরিবিলাস, খোদ মালিক মেজরাজা যা এই বাজারে পেরে ওঠেন না।

সদাশিব বলেন, কেন করবে না বল। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। বিনয় হরবখত চিঠি দিচ্ছে, মায়ের চিকিৎসার কোন রকম ত্রুটি না হয়—

আবার বলেন, সাত চড়ে মুখে একটা কথা ফুটত না, সেই বিনয় একদিন এমন হয়ে উঠবে কে ভাবতে পেরেছে!

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলে বলেন, কপাল! কপাল ছাড়া কী আর বলি। আশিসের কথা তোমরাই সব বলে থাক—কত বুদ্ধিমান আর কী রকম চৌপিঠে। বিনয়ের যদি একগুণ হয়, আশিসের বিশগুণ হবার কথা। কিন্তু পরহিতের ভূত চেপে আছে ঘাড়ে। গ্রামের লোকে কোথায় গিয়ে উঠবে কি করবে, সর্বক্ষণের সেই ভাবনা। আমার নিজের কথা বলি নে—গলা কেটে দুই খণ্ড হলেও পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক পা আমি নড়ব না। কিন্তু সোমত্ত বোন আর পিসি রয়েছে, তাদের ভাবনা ভাবা উচিত উপযুক্ত ছেলের।

সদাশিব তাড়াতাড়ি বলেন, আশিসের নিন্দে কর না মেজরাজা। এখনো বলছি হীরের টুকরো ছেলে। যার যে কাজ, যে পথে যার আনন্দ। এই নিয়ে তুলনা করার কিছু নেই। টাকাই জীবনের পরমার্থ নয়; আবার টাকা কিছু নয় এমন কথাও বলি নে। যে দিক দিয়ে যে জীবনের সার্থকতা খোঁজে।

ভাল ভাল কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অশ্বিনীর আপাতত কানে ঢোকে না। মনে মনে তুলনা করছেন হরিবিলাসের সঙ্গে। পোষ্য হোক প্রতিপাল্য হোক, কর্মচারীর অবস্থা অনেক ভাল মনিবের চেয়ে।

সোনাটিকারির বাস যদি তুলতেই হয়, মাথা পিছু টাকা চারেকের মতো সংগ্রহ হলেই হরিবিলাসের হয়ে গেল। স্টিমার ও ট্রেন ভাড়া। এবং মাথার সংখ্যাও দুটি মাত্র—স্বামী আর স্ত্রী। ছেলে কলকাতায় জমিয়ে বসেছে—উৎকৃষ্ট বাসা, ভাঁড়ারে চাল-ডাল মজুত, ব্যাঙ্কে টাকা। উঠে পড়লেই হল। কিছু করতে হবে না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগারের ভাত খাওয়া। গাঁয়ের উপর ভালবাসা ইত্যাদি যত যা-ই বলুন, জ্ঞানদা শয্যাশায়ী বলেই আজও সেটা পেরে ওঠেন নি। সদরের ডাক্তার এনে এত খরচ-খরচার কারণও তাই। স্ত্রীকে কোন রকমে একটু খাড়া করে তুলতে পারলে বেরিয়ে পড়েন।

আর মেজরাজা অশ্বিনীর হল অকূল-পাথার। ভাবতে গিয়ে থই পান না। সবচেয়ে দায় হয়েছে সেয়ানা মেয়ে বাঁশি। শুধু সেয়ানা বললেই হল না, সুন্দরী মেয়ে। সদাশিব যার নাম দিয়েছেন কাঞ্চনবরণী। রাজবাড়ির কিছুই আর নেই, কিন্তু প্রাচীন বৈভবের ছাপ পড়ে আছে সুপ্রাচীন অট্টালিকায় আর মানুষগুলোর চেহারার উপর। ধবধবে ফর্সা রং, নিখুঁত মুখ-চোখ-নাক প্রায় সকলেরই। কিন্তু বাঁশি দিন-কে-দিন এ কী হয়ে উঠছে! পরিবারের সমস্ত মেয়েপুরুষকে ছাড়িয়ে গেল। যে বিধাতা-পুরুষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, রাজবাড়ির ঐশ্বর্য হরণ করে নিয়ে সুদে-আসলে যেন পূরণ দিয়ে যাচ্ছেন একটি মেয়ের চেহারায়। এ আগুন নিয়ে পথে বেরনো বিপদ। অট্টালিকার নিভৃতে গোপন করে রাখবেন—দেশ ভাগাভাগির হাঙ্গামায় তারও আর উপায় রইল না।

জ্ঞানদা খাড়া হয়ে উঠে কলকাতা ছেলের বাসায় যাবেন, সে বুঝি এ জীবনে আর হল না। সদরের বড়-ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করে রায় দিয়ে গেলেন; হরিবিলাসকে নিভৃতে নিয়ে কানে কানে রোগের

নাম বললেন, ক্যান্সার। শিবের অসাধ্য যে ব্যাধি। রোগও খুব এগিয়ে গেছে। সুস্থ হবার আশা নেই, তবে জীবনের মেয়াদ সামান্য হয়তো বাড়ানো যায়। এবং ওষুধপত্তর দিয়ে রোগের যন্ত্রণার কিছু উপশম করা যেতে পারে।

গাড়িতে উঠে বসে ডাক্তার আবার বলেন, অসীম সহ্যশক্তি আপনার স্ত্রীর। আমি যতক্ষণ ছিলাম, একবার উঃ-আঃ পর্যন্ত করলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। কিন্তু পেটের ভিতর কী রকমটা হচ্ছে, আমি জানি। নিজের জন্যে তাই বলি, অন্য যে ব্যাধি হয় হোক, ক্যান্সার হয়ে যেন মারা না যাই। ওর কষ্টের তুলনা নেই।

শুনতে শুনতে হরিবিলাস কেঁদে পড়লেন। দু-চোখে জলের ধারা গড়াচ্ছে। বলেন, জীবনটাও ঠিক এমনি মুখ বুজে সহ্য করে গেল ডাক্তারবাবু। কোন দিন কারও কাছে একটা দুঃখের কথা বলল না। আমার কাছেও না। তিন তিনটে পেটের সন্তান গেছে। সাংসারিক অভাবও লেগে আছে বারোমাস তিরিশ দিন। ভাল কাজকর্ম করে ছেলেটা অ্যাদ্দিনে দুটো পয়সার মুখ দেখছে। বাসা করেছে মাকে নিয়ে ভাল রকম চিকিচ্ছে করাবে বলে। কিছুই যে হল না ডাক্তারবাবু। ওর মনেও কত আশা—ছেলের বিয়ে দিয়ে কলকাতার বাসায় গিয়ে সংসারধর্ম করবে—

খপ করে হরিবিলাস ডাক্তারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন : তাই করুন, কষ্টটা যাতে কম পায়। অন্তত যদি দুটো মাসও আর ধরে রাখতে পারেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে বউয়ের মুখ দেখিয়ে দেব। ওর বড্ড সাধ। ছেলে রোজগেরে হয়েছে, খরচপত্রের ত্রুটি হবে না ডাক্তারবাবু।

সদরের ডাক্তার আরও কয়েকবার এসে গেলেন। অজ পাড়াগাঁ জায়গায় রাজসূয় চিকিৎসা। এমন সমারোহ অন্য কারো বাড়ি দেখা যায় নি। কৃতী ছেলের ভাগ্যধরী মা—হবে না কেন?

চিকিৎসার গুণে কষ্টভোগ কিছু কমই বটে, কিন্তু মেয়াদ বুঝি আর

বাড়ানো যায় না। রোগিনীর এখন-তখন অবস্থা। কাজকর্ম ফেলে বিনয় কলকাতা থেকে হাহাকার করে এসে পড়ল। মায়ের বিছানার পাশে বসেছে, টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। বাপ ছেলে দু-জনেরই নরম মন, চোখের জল কেউ সামলাতে পারে না।

ছিঃ, বিনয়-দা—

কখন এসে পড়েছে বাঁশি, পিছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে বিনয়ের চোখ মুছে দিল। জ্ঞানদা চোখ বুজে ছিলেন। গলার স্বরে চোখ মেলে দেখেন, স্বর্ণচাঁপার রঙের হাতখানা ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হল। হাতের মালিকটিকেও আর দেখতে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে একদিনের ব্যাপার। বিরজা দেখতে এসেছেন। মিনমিন করে অতি অস্পষ্টভাবে জ্ঞানদা কথা বলেন। মোটের উপর কিছু ভাল আছেন আজকের দিনটা। ম্লান হেসে জ্ঞানদা বললেন, চলে যাচ্ছি দিদি। একবার পায়ের ধূলো দাও।

বালাই ষাট!—বলতে হয়, তাই মুখের স্তোক দিচ্ছেন বিরজা: হয়েছে কী তোমার বউ! এমন কত জনের হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশি হয়। আবার সেরেসুরে উঠবে।

জ্ঞানদা বলেন, তোমরা ভালবাস দিদি, এ তোমাদের আশীর্বাদ। কিন্তু যমদূত শিয়রের কাছে ওৎ পেতে রয়েছে, সর্বক্ষণ আমি টের পাই। দেখ, একটা কথা মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে আনাগোনা করে। সেদিন দেখলাম বাঁশি মা আমার বিনয়ের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। কথাটা সেই সময় আবার নতুন করে মনে উঠল।

বিরজা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেন: ভাল হয়ে ওঠ বউ। তারপরে অন্য কথা।

ভাল আমি আর হব না—

হবে বই কি, নিশ্চয় হবে।

বিরজা একলা অতঃপর জ্ঞানদার কাছে বসতে সাহস পান না।

কি বলে বসেন, এমন অবস্থায় স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলা কঠিন। বিনয়কে দেখছি নে। সে কোথায় গেল? বসুক এসে মায়ের কাছে—ডাকতে ডাকতে ব্যস্তভাবে বিরজা সরে গেলেন।

কথাবার্তাগুলো কি ভাবে বিনয় টের পেয়েছে। ক্ষণপরে সে এসে বলে, অসুখ হয়ে তোমার মা মাথা খারাপ হয়েছে।

জ্ঞানদা বলেন, কেন, কম কিসে আমরা? বংশের দিক দিয়ে আমরাই বরঞ্চ উঁচু। জাঁক করবার মতো ছেলে তুই আমার বিনয়।

তোমার ছেলে নিয়ে মনে মনে তুমি যত খুশি গরব নিয়ে থাক—কিন্তু আমরা আশ্রিত, ওঁরা মনিব আমাদের, এটা কোন দিন ভুলে যেও না।

জ্ঞানদা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, ফুটো রাজত্বের দেমাক বেশি দিন নয় আর। বিদেশে থাকিস, তাই খবর জানিস নে। মেয়ের বিয়ের ভাল ভাল সম্বন্ধ কেঁচে যাচ্ছে শুধু টাকার জন্যে।

ক্লান্তিতে একটু চুপ করে থেকে বলেন, রোগা মানুষ কথাটা বললাম, তা বিরজা-দিদি মুখ ঘুরিয়ে উঠে পড়লেন। বেঁচে থাকব না যে! নয়তো ভাইঝিকে কেমন ঘরে-বরে দেন দেখতে পারতাম। আমার ছেলের তুলনায় কী রকম সে পাত্র!

রোগিনীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা দিয়ে সহসা বিনয় কলরব করে ওঠে: দেখ মা, বাঁশি তোমার জন্য তালশাঁস নিয়ে এসেছে দেখ। সেই যে তখন কথা হচ্ছিল—

জ্ঞানদা বেকুব হলেন। কথাবার্তা শুনে ফেলল নাকি বাঁশি? রেখেঢেকে তো কিছু বলেন নি—শুনেছে ঠিক। পেটের মধ্যে বিষম জ্বালা, সেজন্য তালশাঁসের জল খাওয়ার কথা উঠেছিল—আর দেখ, মেয়েটা তাই শুনে লোকজন যোগাড় করে কাঁচা তাল পাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ভাল মেয়ে, বড় ভাল মন, টান আছে খুব জ্ঞানদার উপর। মেয়েটার অত দেমাক নেই।

ফোঁস করে জ্ঞানদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বাঁশি অনেকক্ষণ রইল। জ্ঞানদার গায়ে হাত বুলায়। পাখা করে। কথাবার্তার কিছু তার কানে গিয়েছে, মনে হল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। জ্ঞানদাই বললেন, যাও মা এবারে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বাঁশি সেই বাঁশবনের নিচে ঘনান্ধকারের মধ্যে

উঠে দাঁড়িয়ে বাঁশি ডাকে : শোন বিনয়-দা। বাঁশঝাড়ের নিচে ভয় করে আমার। জায়গাটা পার করে দিয়ে যাও।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বাঁশি সেই বাঁশবনের নিচে ঘনান্ধকারের মধ্যে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, আমরা দোতলার উপর থাকি আকাশ-ছোঁওয়া কোঠাবাড়িতে। তোমরা একতলার খুপরি-ঘরে। হাত বাড়াতে যেও না কখনো উপর দিকে। পয়সা হয়ে তোমার হাত যত লম্বাই হয়ে উঠুক, অতদূর নাগাল পাবে না।
বলে হুমহুম করে পা ফেলে সদর-উঠানে পড়ে, উঠান পার হয়ে লহমার মধ্যে ভিতর-বাড়ি ঢুকে গেল।

॥ চার ॥

জ্ঞানদা মারা গেলেন। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ন্যাড়া মাথায় বিনয় কলকাতা ফিরল। কত লোক ঠিকানা চেয়ে নেয়ঃ গাঁয়ে থাকা যাবে না। আমরাও গিয়ে পড়ব বিনয়। কোন একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তুমি কলকাতা শহরে আছ, কত বলভরসা! গিয়ে উঠব তোমার বাসায়। যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে, নড়ব না। তাড়িয়ে তো দিতে পারবে না।
এত মানুষের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করবার শক্তি রাখে, বিনয় স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারে নি। শুনে শুনে আত্মপ্রসাদ জাগবার কথা, কিন্তু অস্বস্তিতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই গ্রাম, গ্রামের ঘরবাড়ি, লোকজন, সমাজ-সামাজিকতা কিছুই আর থাকবে না। টলছে। ভেঙে পড়ে চুরমার হবে, দেরি নেই আর তার। সকলে কলকাতা-মুখো তাকিয়ে। কলকাতা অবধি অতদূর না-ও যদি হল, অন্তত-পক্ষে সীমান্ত পার না হয়ে সোয়াস্তি নেই। পার হয়ে গিয়ে হয়তো বা মাঠ-জঙ্গল খাল-বিল—এঁরা ভাবছেন, অনেক ভাল এখানকার এই বাঁধা ঘরবাড়ির চেয়ে।

আপিসের কাজ খুব। অহোরাত্রি ঘুরছে সে চরকির মতো।

সোনাটিকারিতে লোক এসে পড়ছে বাইরের গাঁ-গ্রাম থেকে। মানুষ আগে যা ছিল, এখন তার চার-পাঁচ গুণ। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—বান ডাকলে কিম্বা বাঘে তাড়া করলে যেমন হয়। মানুষ-জন চলে গিয়ে সারা অঞ্চল ফাঁকা, শুধু এই রাজা মশায়দের গাঁয়েই যা-হোক কিছু আছে। সকলে একসঙ্গে থাকলে বল অনেক। শরিকরা চলে গিয়ে রাজবাড়ির বিস্তর ঘর খালি পড়ে ছিল। আশ্রিতেরা এসে জুটেছে, মানুষ কিলবিল করছে এখন সেখানে।

সত্যি, কেমন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চিরকালের পড়শিদের দৃষ্টি আলাদা। হয়তো বা চোখের দোষ এ-পক্ষেরই। কামলা রোগ হলে মানুষ যেমন দুনিয়াময় হলদে রং দেখে। খবরের কাগজে দাঙ্গার খবর—এপারে লেগেছে, ওপারেও। তবে এই সোনাটিকারি অঞ্চলে কিছু নয়। তবু এমনি হয়েছে—চারটে মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, অন্তরাত্মা অমনি গুরগুর করে ওঠে ঃ এই রেঃ, লেগে যায় বুঝি! দাঙ্গা বাধানোর শলাপরামর্শ হচ্ছে।

টেঁকা যাবে না, নিঃসন্দেহ। যেতেই হবে—আজ হোক আর কাল হোক। যেতে যখন হবেই তখন আর কাল কেন, আজকেই। বেড়া-আগুনে কাল হয়তো বেরবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

মেজরাজা ছেলের নিন্দে করতেন, চোখ মেলে এবারে দেখুন কাজকর্ম। খাটতে পারে বটে আশিস। কয়েকটা দিন বিষম ঘোরাঘুরি, আহার-নিদ্রা এক রকম বন্ধ। এর বাড়ি যায়, ওর বাড়ি যায়। ঘরে ঘরে গিয়ে গাঁটরি বেঁধে দিচ্ছে। তারপর এক রাত্রে রওনা হয়ে পড়ল, সঙ্গে নানান বয়সি একগাদা স্ত্রী-পুরুষ। আশিস দলের কর্তা। খুলনা-ঘাটে সকলকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে খাইয়ে ট্রেনে তুলে নিল। ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশন। সেখানে পৌঁছানোর পর ছুটি। শহরে হরেক দল গড়েছে—তারাই এবার ভার নিয়ে নিল। যা-কিছু করবার তারা করবে, না করলে নাচার। ছুটো কথা ঠাণ্ডা হয়ে শোনারও সময় নেই আশিসের। পরের

গাড়িতেই ফেরে। সোনাটিকারিতে ইতিমধ্যে নতুন এক দল তৈরি হয়ে আছে, তাদের আবার পৌঁছে দিতে হবে। গ্রাম আর শিয়ালদহ—টানাপোড়েন অবিরত চলছে।

ট্রেন সীমান্তের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, হিন্দুস্থান অনতিপরেই। মানুষে ঠাসা কামরাগুলো। ছাতের উপরেও উঠেছে কতক, বিচিত্র কৌশলে চাকার পাশে রডের উপরেও গিয়ে বসেছে। ওর মধ্যে চোদ্দআনা মানুষের মুখে টু-শব্দটি নেই—যেন মড়া। হিন্দুস্থানে গিয়ে উঠবে তারা। বাকি দু-আনা কাজেকর্মে চলেছে, আবার ফিরবে, খুব হল্লা-ফুর্তি তাদের। গাড়ি না থামতে চা—চা—করে চেঁচাচ্ছে। পান কিনে দুটো করে একসঙ্গে মুখে ভরছে। হঠাৎ বা তান ধরে ওঠে কেউ একজন।

সীমান্তের স্টেশন পার হল তো মুহূর্তে পট-পরিবর্তন। যাদের হৈ-হল্লায় কান পাতা যাচ্ছিল না, মায়ামন্ত্রে তারা একেবারে নিস্তব্ধ। আর যারা মরে ছিল এতক্ষণ, সমকণ্ঠে তারা হরিধ্বনি দিয়ে উঠল : বল হরি, হরিবোল ! কে হিন্দু কে মুসলমান এখন আর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাবের বদল দেখে বলে দেওয়া যায়।

নতুন দল নিয়ে রওনা হবার মুখে প্রতিবারই আশিস বাপকে বলে, চল বাবা এইসঙ্গে।

অশ্বিনী ভ্রূকুটি করেন : নতুন কী হল আবার ?

আশিসের হাতে পাকানো খবরের-কাগজ। কলকাতা থেকে ফিরবার সময় সে রকমারি কাগজ কিনে নিয়ে আসে। ইদানীং খবরের-কাগজ দেখলে অশ্বিনী ক্ষেপে ওঠেন : যত ঝঞ্ঝাট বাড়ায় এই কাগজে, মানুষের মন তেতো করে দেয়। দু-পক্ষের গবর্নমেণ্ট কাগজগুলো কেন যে বন্ধ করে দেয় না !

আশিস বলে, চোখ বুজে থাকলেই বাঁচা যায় বাবা ?

চোখ মেলে থাকলেই বুঝি বেঁচে যাবে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান দুটো পথের কোনটা যম চেনে না, যমের চোখ কোথায় পড়বে না, বল দিকি আমায় বাপু।

সদাশিবকেও আশিস জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি ইচ্ছে মাস্টার-মশায়? যাবেন?

ইচ্ছে হলেই তো যাওয়া যাবে না। পথ আটকাবে আমার।

আশিস গর্জন করে ওঠে: আনসার-বাহিনী? যাবার ইচ্ছে থাকে তো বলুন। কত জোর তাদের, দেখে নেব।

সদাশিব হেসে বলেন, সে বাহিনী আনসারের চেয়ে অনেক বড় বাবা। সেকালের একালের আমার যত ছাত্র। কিছুতে তারা আমায় ছেড়ে দেবে না।

ইদানীং সদাশিব কিন্তু মাস্টারই নন মোটে। ইস্কুলটা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে-গড়া বলে চক্ষুলজ্জায় তাঁকে একেবারে তাড়িয়ে দেয় নি, কেরানি করে রেখেছে। সেই গোড়ার আমলের এক ছাত্র আফজল খবরটা শুনে একদিন এসে পড়েছিল: মাস্টারমশায়, সত্যি এ সমস্ত? আপনাকে নাকি ক্লাসে পড়াতে দেয় না, মাইনে আদায় করতে হয়?

সদাশিব বলেন, একটা পাশও করি নি, পড়ানোর কি জানি আমি? হোকগে, হোকগে—আছি তো ছাত্রদের মধ্যে, সারাদিন দিব্যি কেটে যায়।

আফজলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আরে ছোঁড়া! এমন ক্ষেপে যাচ্ছিস কেন রে তুই? কী হয়েছে?

আফজলের দাড়িতে পাক ধরে এল। সদাশিবের কাছে কিন্তু সে ছোঁড়া বই আর কিছু নয়। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে আফজলের। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এত খাটুনি খেটে ইস্কুল বানালেন, শেষ পাওনা এই মাস্টারমশায়? নামাতে নামাতে কোথায় এনে ফেলল আপনাকে!

সদাশিব প্রবোধ দিচ্ছেন : দায়িত্ব খসে যাচ্ছে, ভালই তো রে! দেশের যা হাল, কবে আছি কবে নেই। যা স্বপ্নেও ভাবি নি— পালাতে হয় কোন্ দিন বা সোনাটিকারি ছেড়ে!

আফজল বলে, হুঁ, ছাড়বেন! যেতে দিচ্ছে কে? পায়ে ধরে আছাড় খেয়ে পড়ব না! একা আমি নই—যত ছাত্র আছে সেই গোড়ার আমল থেকে।

সদাশিব বলেন, না রে, খবরের-কাগজে নানান গোলমালের কথা লিখছে। ভয়ের কথা।

কিন্তু সদাশিবের ছাত্র আফজল বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। বলে, কাগজের ঐ ব্যাপার সত্যি সত্যি যদি আমাদের তল্লাটে ঘটে, খোদার কসম, জান থাকতে কোন দুশমন আমাদের মাস্টারমশায়ের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

সদাশিব অভিভূত হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বকে উঠলেন : এই যে বললি ছোঁড়া, কোন-কিছু আমি পাই নি। তোদের সব এমন করে পেয়েছি—এর চেয়ে বড় পাওনা কবে কার হয়েছে রে? যা মুখে বলছে, আফজলেরা করবে তাই সুনিশ্চিত। যেতে দেবে না সদাশিবকে, পথের উপর আছড়ে পড়বে দল বেঁধে।

হয়েছে ভাল! পালানোর হিড়িক যত প্রবল হচ্ছে, মেজরাজা আর সদাশিব দরজা ভেজিয়ে ততই আরও দাবায় মেতে উঠছেন। বিশাল সোনাটিকারি গ্রাম ওদিকে শ্মশানঘাটার মতো জনহীন হয়ে উঠল, দুই প্রাচীন সুহৃদের সেদিকে দৃকপাত নেই।

নৌকোর এক মোক্ষম কিস্তি দিয়ে অশ্বিনী হাঁক দেন, বাঁশি!

সদাশিবও ডাকেন, মা কাঞ্চনবরণী—

বাঁশির পাড়ায় ঘোরাঘুরি বন্ধ। লোকজন নেই, যাবে কার কাছে? সর্বক্ষণ ঘরে থাকে। ডাক শুনে সে কাছে এসে দাঁড়াল।

তোর জ্যেঠাকে পান দে। আর কলকেটা পালটে দিয়ে যা আমার।

বাঁশি যেন পাখি হয়ে উড়ে বেরল ঘর থেকে। ক্ষণপরেই ফিরে আসে। ডানহাতে ডিবের মধ্যে পানের খিলি। বাঁ-হাতে কলকের মাথায় কাঠকয়লার আগুন—ফুঁ দিতে দিতে আসছে। আগুনের আঁচে দেবীপ্রতিমার মতো মুখে রক্ত-আভা ফুটেছে। ডিবা রাখল তক্তপোশের উপর, সদাশিব ডিবা খুলে দুটো খিলি মুখে দিলেন। হুঁকোর উপর কলকে বসিয়ে বাঁশি বাপের হাতে এগিয়ে দেয়।

মেয়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী বললেন, রাজবাড়িতেও ভয় ঢুকে গেল, আশিস নিয়ে বের করতে চায়। বলে দিয়েছি, যাও যদি ইচ্ছে হয়। যাকগে ওরা চলে। দিদি চলে যান, আশিস চলে যাক। শিব-দাদা আর আমি—তার উপরে আমাদের মা-জননী গার্জেন হয়ে এমনি যদি আশেপাশে ঘুরঘুর করে, কাউকে আর দরকার নেই। কী বল শিব-দাদা?

সদাশিব মাথা নেড়ে সায় দেন: বটেই তো, কী দরকার!

বলতে গিয়ে চমক খেলেন সদাশিব। কোথায় ছিলেন বিরজা, করকর করে এসে পড়েন। সদাশিবের দিকেই চেয়ে তাঁকেই সাক্ষি মেনে বলেন, শোন কথা। মা-জননীকে ফেলে আমরা চলে যাব, সে তোমাদের পান-তামাক সেজে খাওয়াবে। কিছু না হোক ওই মা-জননীর জন্তেই তো পাগল হয়ে ছুটে বেরুনো উচিত। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ভাবনায় আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার কথা, তা নয় নির্বিকার বাপ বসে বসে দাবা খেলেন আর তামাক খান।

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিক।

অশ্বিনী মুখ তুলে ম্লান হেসে বললেন, দাবা খেলে আমি ভাবনা ভুলতে চাই দিদি। ভেবে কোন হদিস পাই নে। মেয়ে নিয়ে ঘরে থাকা মুশকিল—কিন্তু পথে বেরুনো আরও যে মুশকিল, সেটা ভেবে দেখেছ? বাঁশি আমার যদি কালো-কুচ্ছিৎ কিম্ভূতাকার মেয়ে হত।

সদাশিব পুনশ্চ সমর্থন করেন : সত্যি কথা।

একটু চুপ করে থেকে সদাশিব আবার বলেন, কিন্তু উপায় তো কিছু চাই। আমি বলি, কাঞ্চনবরণীকে পরঘরি করে দাও তাড়াতাড়ি। পথে বেরুল না, ঘরেও রইল না। যাদের বউ, তারা তখন বুঝবে। বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগ।

চেষ্টা কি কম করছি! কিন্তু—। আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজিয়ে অশ্বিনী বলেন, তার জন্যে চাই রুধির। রাজকোষে নিতান্তই ফুলোডুমুর। মেয়ের রূপ আছে সে ভালই, তা বলে পাওনাগণ্ডা ছাড়বে এ বাজারে এমন হাঁদারাম কেউ নেই। খাজাঞ্চি হরিবিলাস তো শুকিয়ে আছে। বলে, পৌষমাস অবধি ঠায় বসে থাকুন এখন। প্রজাপাটকের উপর যত হাঁকডাক করুন, পৌষের কিস্তির আগে কেউ আধেলা পয়সা ঠেকাবে না। বসে বসে তা হলে কি করব বল দাবাখেলা আর তামাক খাওয়া ছাড়া?

॥ পাঁচ ॥

ক-দিন পরের কথা। পাইক চূড়ামণি সর্দার হন্তদন্ত হয়ে চলেছে। মেজরাজা তাকে ডেকে মধুস্বরে বললেন, শোওয়া নেই বসা নেই, সর্বসময়ে তো টহল দিচ্ছ। আদায়পত্তরের গতিকটা কি, তোমার কাছেই শুনি।

মনিবের তোয়াজে গলে গিয়ে চূড়ামণি বলে, হুজুরের হুকুম হয়েছে—সকাল বিকাল একগাদা করে প্রজা এনে কাছারি-দালানে হাজির করে দিই।

সে তো জানি। কিন্তু এসে কি বলে তারা? টাকাকড়ি দেয় কই? সগর্বে চূড়ামণি বলে, না দিলে ছাড়ব কেন? একবারের জায়গায় দশবার যাব সেই লোকের বাড়ি। কোথাও পালিয়ে থাকে তো

চেপে বসে থাকব, দরকার হলে উঠানের উপর উনুন খুঁড়ে রান্না-খাওয়া করব সেখানে।

তুমি এত খাটনি খাটছ, কিন্তু হরিবিলাসকে জিজ্ঞাসা করলে তো মাথা চুলকায়। বলে, আসেই মানুষ—এসে তামাক-টামাক খেয়ে চলে যায়। টাকাকড়ির বেলা লবডঙ্কা।

চূড়ামণি চুপ করে থাকে।

আশিস এসে পড়েছে কখন। হেসে উঠে সে বলে, বাকি্য হরে গেল যে সর্দার। পথে পথে ঘুরি, কিন্তু ঘরের খবরও কিছু কানে আসে। বলে ফেল পেটের মধ্যে যে সব কথা আঁকুপাকু করছে।

আজ্ঞে, খাজনাকড়ি আদায় বড়দের ব্যাপার। খাজাঞ্চিমশায় জানেন। সামান্য পাইক মানুষ আমি এর মধ্যে কি বলব?

হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে আশিস বলে, ভাগে বনিবনাও হচ্ছে না—জানি গো, জানি সে খবর।

অশ্বিনী ছেলেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন: আচ্ছা, তুমি কি জন্য বাগড়া দাও কথার মধ্যে এসে, বৈষয়িক ব্যাপারের তুমি কি বোঝ? পরের হিত নিয়ে আছ, সেই কাজে চলে যাও।

চূড়ামণি আহত কণ্ঠে অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলে, তাই বলুন হুজুর। আমি পাইকগিরি করি, ছুটোছুটি গালমন্দ করে প্রজা হাজির করে দেওয়া কাজ, আমার সঙ্গে কে ভাগাভাগি করতে যাচ্ছে? কেনই বা যাবে?

আশিস তবু নিরস্ত হয় না। বলে, ভাগ যদি না থাকবে, তোমার দশ টাকা মাইনে আর খাজাঞ্চি-কাকার পঁচিশ—এই মাইনের উপরে এমন তেলটি-ফুলটি হয়ে থাক কেমন করে শুনি? [illegible] মানুষ বলে চোখ মেলেও আমাদের অন্ধ হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু দেখতে পাই সব।

হাসতে হাসতে আবার বলে, চাইও আমার ঠিক এই। বরাবর চেয়ে এসেছি। এই মাইনেয় কারো চলতে পারে না, সেটা কে না

বোঝে? ঠারেঠোরে তাই বলা আছে—আমাদের মেরো না ভাইসকল, হাবাগবা প্রজাগুলোর উপর দিয়ে যদ্দূর পার, উশুল করে নাও।
আরও হয়তো বলত। অশ্বিনী কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়তে থেমে গেল। ছেলেকে থামিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করেন, পুরানো লোক তুমি, বলতে গেলে ল্যাংটা বয়স থেকে আমাদের নুন খাচ্ছ। বলে ফেল দিকি ভিতরের গুহ্যকথা। জানা আছে মোটামুটি সমস্ত, তবু তোমার মুখে শোনা যাক।
এদিক-ওদিক তাকিয়ে তখন চূড়ামণি নিচুগলায় বলে, টাকা দেয় বই কি প্রজারা। কাছারিতে রমারম টাকা পড়ে, হুজুরেই কেবল জমা পড়ে না।
আশিস বলে, কি হয় সে টাকা?
একটু থেমে অধীর কণ্ঠে বলে, কাছারির সিন্দুকে পড়ে থাকে, না অন্য কোথাও চলে যায়?
চূড়ামণি সর্দার নিরীহ মুখে বলে, শুনুন কথা! এক জায়গায় পড়ে থাকবার জিনিস নাকি টাকা? টাকার যে পাখনা গজায়, টাকা ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়।
বলতে বলতে খেয়াল হয়, কথার টানে অনেকখানি বলে ফেলেছে। সামলে নিয়ে চূড়ামণি বলে, তাগাদায় বেরিয়েছি। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আজ্ঞে করুন হুজুর, বেরিয়ে পড়ি।
আশিস বাধা দিয়ে বলে, কথাটা শেষ করে যাও—
ছোট মুখে বিস্তর বড় কথা হয়ে গেছে। প্রজা হাজির করে দিয়ে আমার দায় খালাস। খাজনাকড়ি কি দিল, কোথায় গেল সে টাকা, আমি তা কেমন করে জানব? মেজরাজা মশায় সমস্ত জেনে শুনে বসে আছেন, আমায় শুধু নিমিত্তের ভাগী করা।
হনহন করে চূড়ামণি অদৃশ্য হল। আশিস বোমার মতন ফেটে পড়ে: সবই তো বলে গেল, বলতে আর বাকি রইল কোনটা?

আমাদের এই অস্থিতপঞ্চক অবস্থা, টাকার জন্তে বাঁশির বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। খাজাঞ্চি-কাকা তবিল মেরে বসে আছেন ওদিকে। এক্ষুনি হিসাবনিকাশ চাও বাবা। দশজনের মুকাবেলা।

কিন্তু অশ্বিনী বিচলিত নন। মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলেন, হবে, তাড়াহুড়োর কাজ নয়।

চূড়ামণির কথা তুমি বিশ্বাস করলে না। কিম্বা পুরানো লোক বলে তোমার বোধ হয় মায়া হচ্ছে।

অশ্বিনী বলেন, হরিবিলাস অনেক দিনের কর্মচারী, সেটা কিছু মিথ্যে নয়। অকাট্য প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ সে সাধুচরিত্র। একদিন ছিল, দু-হাজার পাঁচ হাজারের তবিল হামেশাই তার কাছে মজুত থাকত। তখন কিছু করল না, এখনকার এই ছিটেফোঁটায় লোভ করতে যায় কেন?

আশিস বলে, চূড়ামণি সর্দার মিথ্যে বানিয়ে বলবে, এতখানি সাহস হবে তার?

অশ্বিনী বার দুই এদিক-ওদিক ঘাড় নেড়ে বলেন, কক্ষনো না। তবিল মেরেছে হরিবিলাস ঠিকই। কিন্তু এই বয়সে কি জন্ত কুকর্ম করতে গেল, সেইটে ভাবছি।

আশিস অধীর হয়ে বলে, আমরা ভাবনাচিন্তা করতে থাকি, টের পেয়ে উনি ওদিকে সামাল হয়ে যাবেন। চোর কি সাধু খাতাপত্র দেখলেই তো প্রমাণ হয়ে যায়।

এবারে স্পষ্ট বিরক্তির সুর মেজরাজার কণ্ঠে। বললেন, এক্ষুনি কিছু নয়। বয়স হয়েছে, হুট করে কিছু করতে পারিনে তোমাদের বুদ্ধি নিয়ে। তুমি দশের হিত নিয়ে আছ, সংসারের দায়ভার আমার উপরে। যেমন বুঝি ভেবেচিন্তে সেই রকম আমায় করতে দাও বাপু।

রাত্ত দুপুরে মেজরাজা আশিসের ঘরে এসে তাকে ডেকে তুললেন।

কি বাবা?

চলে এস। কাছারি-দালানে যাচ্ছি।

আশিস অবাক হয়ে বলে, নিশিরাত্রে—এখন?

দশের মুকাবেলা কিছু করতে চাইনি। রাতের অপেক্ষায় চুপচাপ ছিলাম। কেউ কিছু জানবে না তুমি আর আমি ছাড়া।

আশিস বলে, দালানের চাবি তো খাজাঞ্চি-কাকার কাছে। ঢুকবে কি করে?

এসই না—

হাসতে হাসতে অশ্বিনী বললেন, দেখ এসে ঢুকতে পার কিনা। সেই যে বললাম, দায়ভার আমার উপরে—আমিই ঢুকিয়ে দেব।

সামনের সদর-উঠানে গেলেন না। একটা ছোট্ট দরজা পিছনে খিড়কির দিকে। সে দরজা বন্ধই থাকে সর্বদা, ভারী ভারী তিনটে তালা ঝোলানো। অশ্বিনী কলঙ্ক-ধরা একতাড়া চাবি বের করলেন: চাবি আমার কাছে রয়েছে। এদিককার তালা খোলা যায়, লোকে ভাবতে ভুলে গেছে।

আশিস বলে, খুলেই বা কি হল? ভিতরের দিকে খিল-হুড়কো আঁটা।

ধাক্কা দাও দেখি এবারে। আস্তে, মোলায়েম করে, আওয়াজ না হয়।

ফিসফিসিয়ে অশ্বিনী আবার বলেন, কী না কী করছি—এমনি ভাবে বিকালবেলা কাছারির এই দিকটা এসে খিল-হুড়কো খুলে রেখে গেছি। চোরে যেমনধারা করে। নিজের ঘরে চৌর্যবৃত্তি। হরিবিলাস ঠাহর করে নি, সে এত সমস্ত ভাবতে পারে না।

বাপ-ছেলে কাছারি-দালানে ঢুকে ভিতর থেকে এবার খিল দিয়ে দিলেন। মোমবাতি নিয়ে এসেছেন মেজরাজা। আশিসকে বলেন, জানলাগুলো ভাল করে এঁটে দাও চারিদিক ঘুরে। বাতি

জ্বালব। আলো বাইরে না বেরোয়, কারও নজরে না আসে। ঐ যে বললাম, চোর হয়ে ঢুকেছি আজকে আমরা।

বাতি জ্বেলে অশ্বিনী কাছারির আয়রনসেফ খুলে ফেললেন। আশিসের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। বলে, খাজাঞ্চির সিন্দুকের চাবি তোমার কাছেও ?

মেজরাজা হেসে বলেন, দিব্যি করে বললেও কিন্তু হরবিলাস বিশ্বাস করবে না। একসেট ডুপ্লিকেট চাবি দেয়, তা-ও তার কাছে। বছর কুড়ি আগে এই সিন্দুক কেনা। কেনবার সময় মনে হল, খাজাঞ্চির অজান্তে যদি কখনো সিন্দুক খোলার দরকার হয়, তার একটা ব্যবস্থা থাকা ভাল। বেশি পয়সা দিয়ে তখনই দুটোর জায়গায় তিনটে চাবি বানিয়ে একটা নিজের কাছে রাখলাম। বিশ বছর বাদে আজ সেই চাবি কাজে লাগল। নজর কতদূর অবধি মেলে রেখে বৈষয়িক কাজকর্ম করতে হয়, বুঝে দেখ তা হলে। হঠাৎ কিছু করবার বস্তু নয়।

টাকার থলি, রেজগির থলি, নোটের থাক বেরুল সিন্দুকের নানান খোপ থেকে। ভাল করে দেখে নিয়ে মেজরাজা বলেন, আর নেই। তুমি গুণে ফেল। আমি হিসেবটা দেখে নিই তাড়াতাড়ি।

কড়চা সেহা আর জমাখরচ তিনটে জিনিসেই মোটামুটি তহবিলের হিসাব পাওয়া যায়। টাকা সামান্যই, গুণতে আশিসের সময় লাগে না। কিন্তু খাতার প্রতিটি যোগ অশ্বিনীকে পরখ করে দেখতে হচ্ছে, ভুল বেরুচ্ছে ক্রমাগত।

উঁকি মেরে দেখে আশিস বলে, আগাগোড়াই কম। খাজাঞ্চিকাকা যোগফল ইচ্ছে করে কম করে রেখেছেন। ভুল সত্যিকার হলে দু-এক জায়গায় বেশিও তো হবে।

অশ্বিনী জবাব দিলেন না।

আশিস আবার বলে, তবিলের সঙ্গে গরমিলটা হঠাৎ দেখে কেউ

ধরতে না পারে, সেজন্ত জাল হিসাব। পুরানো কর্মচারীর কথায় তুমি তো পঞ্চমুখ—বোঝ এইবারে।

অশ্বিনী সংক্ষেপে বললেন, একজনে সমস্ত দেখতে গেলে রাত কাবার হবে। তুমি ধর দিকি ঐ খাতাটা।

দু-জনে মিলেও ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল। খুব একটা-কিছু নয়, শ' দেড়েক টাকার এদিক-ওদিক। এত কষ্টস্বীকারের পর হতাশ হতে হল। টাকার থলি তুলে রাখতে গিয়ে ঐ সিন্দুকেরই কোণ থেকে পাতলা এক হাতচিঠে বেরিয়ে পড়ে। বস্তুটা আগে ঠাওর হয়নি।

দেখি, দেখি, এই হল আসল। আরে সর্বনাশ!

হাতচিঠের মধ্যে কতকগুলো প্রজার নাম, নামের পাশে পাশে টাকার অঙ্ক। টাকা দিয়ে গেছে, কিন্তু এস্টেটের খাতায় জমা পড়েনি। গোপনে হাতচিঠেয় টুকে রেখেছেন স্বাচ্ছল্যের দিনে দাখিলা কেটে খাতায় হিসাব তুলতে পারবেন সেইজন্ত। এর নাম উশুল-ছাট—সেরেস্তার কর্মচারীর পক্ষে সব চেয়ে বড় অপরাধ।

আশিস টিপ্পনি কাটে: তোমার যে পুরানো বিশ্বাসী লোক—

মেজরাজার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়: তাই তো ভাবছি রে! ছাব্বিশ বছরের কাজে কখনো ছাব্বিশটা পয়সার তঞ্চক হয়নি, সেই মানুষ কেন এমন হয়ে যায়?

আশিস বলে, পায়ের তলার মাটি টলছে। এমনই সব হবে এখন। এদ্দিন যে হিসাবে জীবন কেটেছে, সমস্ত গরমিল এবারে। চাকরি তো চাকরি, মানুষটাই কখন আছে কখন নেই—বুদ্ধিমান এ অবস্থায় সততা আঁকড়ে ধরে মরতে যাবে কেন? কিন্তু ছাড়া হবে না, নিমকহারামের উপর দয়াধর্ম নেই। সকাল হলে থানায় এজাহার দেব। আর ঐ পথে অমনি সদরে গিয়ে ফৌজদারি রুজু করে আসব। আমিই সব করব বাবা।

চুপ! তাড়া দিয়ে উঠলেন মেজরাজা। একেবারে কিছু নয়।

হরিবিলাস বুঝতে না পারে যে আমরা ভিতরে এসেছিলাম। সন্দেহ একটুও না আসে।

পুরানো কর্মচারী মশায় লজ্জা পাবেন, সেই জন্যে বুঝি ?

অশ্বিনী বললেন, জেল হলে হরিবিলাসের খুবই ক্ষতি, কিন্তু আমাদেরও ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। দিনকাল খারাপ, ক্ষতি আমাদেরটা যদি বাঁচানো যায়। আমি সেইটে ভাবছি।

পরদিন সকালবেলা যথারীতি কাছারি বসেছে। দালানের একপাশে তক্তাপোশের উপর মনিবের জন্য আলাদা একটু গদি। কাজকর্ম যৎসামান্য বলে গদি প্রায় শূন্যই থাকে। বিকালের দিকে কোনদিন মেজরাজা এসে হয়তো একটু বসলেন।

আজকে সকালবেলাই চলে এসেছেন। মাতব্বর প্রজা নিধিরাম রাহুতকে দেখে ডাকলেন : শোন নিধিরাম, আমার কাছে ইদিকে এসে বস।

খাতির করে বেঞ্চিতে বসিয়ে নিচুগলায় অন্তরঙ্গ ভাবে বলেন, একটা খবর কানে এল নিধিরাম। বিলের ধান-জমি কিছু কিছু তুমি নাকি ছেড়ে দিচ্ছ ?

নিধিরাম ঢোক গিলে বলে, কে বলল ?

মেজরাজা বলেন, বলাবলির কি আছে ? এই তো নিয়ম হয়ে উঠেছে। তুমি বলে কেন, সকলে এই করছে। আজ বিলের জমি বেচবে, দু-দিন পরে ডাঙা-জমি বেচবে। তারপরে হল তো ভিটেমাটি বেচে দিয়ে একেবারে ফৌত।

নিধিরাম বলে, না কর্তাবাবু, আমি সে লোক নই। ভিটে ছেড়ে যাব কোন চুলোয় ? আমরা থাকব।

মেজরাজা একগাল হেসে বলেন, এ-ও নিয়ম। স্টিমারে ওঠার আগে পর্যন্ত বলতে হয়, যার খুশি যাক চলে, আমি এক পা নড়ছিনে ভিটেবাড়ি ছেড়ে। সে যাকগে। শুনেছি আমি বিশেষ সূত্রে।

জমির যে দর ওঠে, আমায় জানিও। আমার অজান্তে যেন বিক্রি হয়ে না যায়।

এবার সহজ হয়ে নিধিরাম বলে, জমি নেবেন নাকি রাজাবাবু?

তোমার ঐ জমি যদি বিক্রি কর নিশ্চয় নেব। অন্য কেউ বেচলে সে খবরও যেন পাই।

জমির দরদস্তুর নিয়ে কথাবার্তা চলে কিছুক্ষণ। যত নিচু গলায় হোক, সেরেস্তার কর্মচারীর কান এড়ায় না। নিধিরাম চলে গেলে হরিবিলাস কাছে এসে বলেন, কী আশ্চর্য। এখন নতুন জমিজমা করবেন ?

এই তো সময়। জমি জলের দরে যাচ্ছে। দু-শ' টাকা বিঘে হিসাবে যা বিকাত, কুড়ি টাকা দর পেলে মালিক এখন সোনা হেন মুখ করে তাই দিয়ে যাবে।

কিন্তু একলা খোকাবাবুই তো অঞ্চল ফাঁকা করে ফেলল।

কাঁচা বয়স—তাজা রক্তের জোরে ছটফট করে বেড়ায়। বুড়োমানুষ আমরা অমন পেরে উঠিনে, জায়গায় অনড় হয়ে থাকা আমাদের পছন্দ। এই যেমন আমি, শিব-দাদা—আর তুমিও।

একটু থেমে অশ্বিনী বলেন, চলে যাচ্ছে মানুষ—ভালই তো! জমিজমা কিছু বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না। পুরো গাঁয়ের মালিক হয়ে বসব আমরা তিন জনে। যার বাড়ির যত আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি, সমস্ত আমাদের। যে পুকুরে যখন খুশি জাল নামিয়ে রুই-কাতলা তুলে তুলে খাব।

খুব হাসছেন: কষে আদায়পত্তর লাগাও হরি। মহাল কবুতর-চোখো করে ফেল। সমস্ত টাকা নতুন সম্পত্তিতে লগ্নি করব। আমাদের পরগনার বেশির ভাগ তো বেহাত হয়েছে। খানিক খানিক উদ্ধার করে ফেলব এই মওকায়।

হঠাৎ বলে উঠলেন, সালতামামি নিকাশের ভরসায় থাকলে হবে না হরি, আজ থেকেই খাতাপত্র নেড়েচেড়ে বুঝসমঝ কর। টাকার

বড় টান। কোন কোন প্রজার ব[illegible], লিষ্টি করে ফেলি দুজনে। কাছারিতে নিয়ে এসে তারপরে চাপাচাপি করা যাবে।

লক্ষ্য করছেন, ফ্যাকাশে হয়ে গেল হরিবিলাসের মুখ। মিনমিন করে হরিবিলাস বলেন, এখন টাকা কে দেবে, পাবেই বা কোথায় ?

মেজরাজা কড়া হয়ে রায় দিলেন : পৌষমাসে কবে নতুন ধান উঠবে, ততদিন সবুর করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে আমি পারব না। যাদের বকেয়া বাকি, চূড়ামণি ঘাড় ধরে এনে এনে হাজির করুক। তারপরে আমি দেখব। আমি জানি, আদায় কেমন করে করতে হয়। এখন থাক, বেলা হয়ে গেছে। ওবেলা থেকেই— কেমন ?

হরিবিলাস ঘাড় নেড়ে দিলেন, না নেড়ে উপায় নেই। মুখে কিছু বললেন না। চলে যাচ্ছিলেন মেজরাজা। ঘুরে দাঁড়ালেন হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে। বললেন, ওবেলাও তো হয় না। সদরে পুণ্ডরীক উকিলের কাছে তুমি রওনা হয়ে যাও ওবেলা। চকোত্তিদের গড়ভাঙা-গাঁতি নিলাম হবে, দেরিও বেশি নেই তার— মুহুরির কাছ থেকে সঠিক তারিখটা জেনে তদ্বিরের ব্যবস্থা করে এস। গোটা তিনেক ডিগ্রির তামাদি এবারে, সময় মতো যাতে জারি হয়, সেটাও মনে করিয়ে দিও। তাড়াতাড়ি ফিরে এস। ফিরলে তখন এদিককার কাজ।

অতএব সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে হরিবিলাস সদরে রওনা হয়ে গেলেন। আশিসের কানে গিয়েছে—চূড়ামণির আপাতত কোন কারণে হরিবিলাসের উপর রাগ, সে-ই সব বলেছে। বিরজার কাছে গিয়ে আশিস বলে, বাবার কি রকম কাজ, বুঝতে

পারিনে। চোরটাকে ভাল মতো শিক্ষা দেব—তা নয়, নাগালের বাইরে সদরে পাঠিয়ে দিলেন।

অশ্বিনী শুনতে পেয়ে দিদির সামনেই ডাকলেন ছেলেকে: এই বলেছ তুমি ?

আশিস বলে, খাজাঞ্চি-কাকা খুব সম্ভব সদর থেকে কলকাতায় চলে যাবেন।

অশ্বিনী সায় দিয়ে বলেন, আমিও তাই মনে করি। বছরের মাঝখানে আচমকা নিকাশ চেয়েছি, প্রজা-ডাকাডাকি হবে সে-কথাও বলে দিয়েছি—এত বড় বিপদ নিশ্চয় ছেলেকে বলতে যাবে। আমিও চাচ্ছি তাই। ঠিক এই জন্যই অজুহাত করে হরিবিলাসকে সদরে পাঠালাম।

॥ ছয় ॥

পাকা লোক অশ্বিনী, লোকচরিত্র দেখে দেখে ঘুণ হয়েছেন। আন্দাজ খাঁটি। সদর থেকে হরিবিলাস কলকাতার টিকিট কাটলেন।

ঠিক কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরে শহরতলি জায়গা। দমদম স্টেশন ছেড়ে অনেকটা দূর যেতে হয়। গোলমেলে রাস্তা সব এদিকে চিঠির ঠিকানায় যে রাস্তা লেখে, লোকে তা চিনতে পারে না। তাদের মুখে পৃথক নাম—রথতলা, চৌধুরিপুকুর, বাবুর বাগান—এমনি সব। শেষটা রাস্তার যদিই বা হদিস হল, নম্বর মেলে না। নম্বরের চাকতি কোন বাড়ি কেউ লাগায় না। জয়ন্তী-প্রেসের নাম করতে একজনে একটু ভেবে নিয়ে জায়গাটার বর্ণনা দিয়ে দিল।

বর্ণনা অনুযায়ী এগোতে এগোতে বিশাল বাগানবাড়ির সামনে এসে পড়লেন। ফটকখানাই বা কী—একবেলা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখবার

। ফটকের মাথার উপর পশুরাজ সিংহ থাবার নিচে ফুটবলের সাইজের গোলাকার এক বস্তু চেপে ধরেছে। এমন বাড়িতে বিনয় থাকে? থাকে, তাতে সন্দেহ নেই—অতিকায় ফটকের গায়ে লেখা রয়েছে—জয়ন্তী-প্রেস।

রাস্তার উল্টো পারে অনেকখানি জঙ্গুলে জমি ঘিরে মস্তবড় সাইনবোর্ডে লিখে দিয়েছে—ডেভিড বিস্কুট-ফ্যাক্টরি। ইট ও লোহালক্কড় গাদা করে রেখেছে একদিকে। মাটি খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, লোকজন খাটছে। জয়ন্তী-প্রেসে বিনয়ের ঠিকানা। তবু অতবড় ফটকের ভিতরে ঢুকতে পাড়াগাঁয়ের মানুষ হরিবিলাসের সাহস হচ্ছে না। ইতস্তত করছেন।

ঠাহর হল, ফটকের লাগোয়া ছোট্ট একটু চাতালের উপর গরম-চা ও পান-বিড়ির দোকান। চা ভরতি পিতলের কলসি, গলার দিকে নল লাগানো। তোলা-উনুনে কলসি বসিয়ে গরম রেখেছে। ওদিককার জমি থেকে মজুর শ্রেণীর আসছে একজন দুজন, দোকানের মালিক মাটির ভাঁড়ে চা ঢেলে দিচ্ছে। চা খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে কাজে চলে যাচ্ছে আবার তারা।

হরিবিলাস এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বিনয় বলে কেউ থাকে ভিতরে?

হুঁ, থাকেন। ঢুকে পড়ে সোজা চলে যান। ঝিলের পুল পার হয়ে পুকুরঘাটের পাশে পাকাবাড়ি। সেইখানে পাবেন।

হরিবিলাসের মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে জ্ঞানদার কথা ভেবে। এমন ঘরবাড়িতে থাকে বিনয়—যদি সে একবার চোখে দেখে যেতে পারত! মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা বিনয় বারম্বার লিখেছে, রোগের অবস্থা বিবেচনায় আনা হয়নি। কিন্তু বড়-ডাক্তার দেখিয়ে পরিণাম সম্পর্কে যখন নিঃসংশয় হওয়া গেল, সেই সময়টা এনে ফেললে হত। আনা উচিত ছিল, চিরদুঃখিনী চোখ মেলে ছেলের সুখ দেখে যেতেন। একটা সান্ত্বনা, জ্ঞানদা আজ যে

লোকে আছেন সেখানে নাকি পলকে সর্বত্র ভেসে বেড়ানো চলে। বায়ুভূত হয়ে মা হয়তো ছেলের সমৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন।

ঢুকে পড়লেন হরিবিলাস। যত এগোচ্ছেন, তত তাজ্জব। ইন্দ্রপুরী বানিয়েছিল রে! অযত্নে অবহেলায় জাঁকজমক মলিন হয়ে গেলেও অতীত গরিমা বোঝা যায়। গাঙ হেজেমজে গিয়েও খাল হয়ে থেকে যায় যেমন। অসংখ্য গাছগাছালি—আম লিচু নারকেল ইত্যাদি, এবং বিদেশের বহু নাম-না-জানা গাছ। ফুল কত রকমের—জঙ্গল হয়ে গিয়েও কিছু কিছু ফুটে রয়েছে। খানিক এগিয়ে আঁকাবাঁকা ঝিল, উপরে কাঠের পুল। এবং আরও দূরে বড়-পুকুরের পাড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে পাকাবাড়ি। সোনাটিকারির রাজবাড়ি অতিশয় প্রকাণ্ড, কিন্তু হালফ্যাশানের নয়। পাড়াগাঁয়ে যত ঐশ্বর্যই থাক, হালকা কাজের উপর ছবির মতন এমন বাড়ি কেউ ভাবতে পারে না। রাজামশায়রা থাকতে পান না, কিন্তু রাজবাড়ির খাজাঞ্চির গুণবান ছেলে থাকে এমন জায়গায়।

খবর পেয়ে বিনয় বেরিয়ে আসে। কাজ করতে করতে ছুটে এসেছে। সর্বাঙ্গে কালিঝুলি-মাখা, গায়ে গেঞ্জি, পরনে নীল হাফপ্যান্ট। কী পোষাক, কী চেহারা! অদূরের কলে হাত ধুয়ে এসে বিনয় বাপের পায়ের ধূলো নেয়।

স্তম্ভিত হরিবিলাস বলেন, চাকরি করিস তুই যে বলেছিলি?

হাসিমুখে বিনয় বলে, চাকরি তো এই। মেশিন চালাচ্ছিলাম বাবা। ছাপাখানার মেশিন।

ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে—

বাপের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বিনয় বলে, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে একটা পাশও যে দিইনি। কম্পোজিটার হয়ে ঢুকেছিলাম। এখনো তাই—চিমটি ধরে টাইপের পাশে টাইপ সাজিয়ে যাওয়া। ভাগ্যিস ঢুকেছিলাম, নয় তো পথে পথে ভিক্ষে করা কিম্বা না খেয়ে

মরা ছাড়া উপায় ছিল না। মেশিনম্যানের বড্ড দেমাক, একদিন আসে তো দুদিন আসে না। শহরের বাইরে ধাপধাড়া জায়গা বলে প্রেসে আমাদের কাজকর্ম কম, বেশি মাইনের লোক রেখে পোষায় না। তাই ভাবলাম, মেশিন চালানোই বা কী এমন শক্ত কাজ। শিখে নিয়েছি, অবরেসবরে আমিও চালাই।

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে বলে, এর উপরে আরও আছে বাবা। হিসাবপত্র রাখা, বিল আদায় করা, পার্টির সঙ্গে দরের ঠিকঠাক করা—প্রেস এমনই অচল, তার উপরে এক গাদা লোক রেখে পোষাবে কি করে ? জয়ন্তী-প্রেসের বলতে গেলে আমিই এখন সব—কম্পোজিটার, মেশিনম্যান, একাউণ্ট্যাণ্ট, বিল-সরকার, ম্যানেজার,—একাধারে সমস্ত।

বিনয়ের সঙ্গে হরিবিলাস চলতে আরম্ভ করেছেন। বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সবিস্তারে শুনছেন বিনয়ের চাকরির কথা। এই বাগানবাড়ির মালিক হলেন ভবানীপুরের রায়েরা দুই ভাই— রঞ্জিত রায় ও ইন্দ্রজিত রায়। খেয়ালি রগচটা মানুষ রঞ্জিত, কিন্তু কর্মবীর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে বড় হয়েছেন। ব্যবসা করে বড়লোক। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে চিংড়িঘাটায় খড়ের গোলা করলেন গোড়ায়। তারপরে এক বোন মিলের কিছু শেয়ার কিনলেন। সেই মিল সম্পূর্ণ এখন রায়েদের—সাহেব পার্টনার নিজের অংশ সামান্য টাকায় ছেড়ে দিয়ে বিলেত চলে গেছে। কিন্তু ঐ একটি মাত্র বস্তু নিয়ে থেমে থাকবার মানুষ নন রঞ্জিত রায়। ব্যবসা কত ধরলেন কত ছাড়লেন, লেখাজোখা নেই। যে-কেউ এসে কোন-একটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেই হল। স্ত্রী জয়ন্তী মারা গেছেন, কিন্তু যত-কিছু ব্যবসা জয়ন্তীর নামে। সেই যে তিনি গায়ের গয়না খুলে ব্যবসায়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন, রঞ্জিত তা ভুলতে পারেন না। কিছু দিন আগে এই জয়ন্তী-প্রেস করেছেন। প্রেস ঘাড়ে এসে পড়ল

এক বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে। ব্যবসার জন্য তাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। প্রেস করে চালাতে পারে না, তখন আগের টাকার উপরে আরও কিছু টাকা নিয়ে প্রেসটাই সে রঞ্জিতকে দিয়ে দিল। জায়গা না পেয়ে এই বাগানবাড়িতে তুলে এনে আপাতত কাজ চলছে। কিন্তু আর বেশি দিন নয়, প্রেসের নেশা কেটে এসেছে। বিনয় লেগেপড়ে ইতিমধ্যে কাজকর্ম ভাল করে শিখে নিচ্ছে। কাজ শিখলে বসে থাকতে হবে না। আর মনে হচ্ছে, একটুখানি সে বড়বাবুর নেকনজরে পড়েছে।

হরিবিলাস বলেন, বাসার তো এই ঠিকানাই দিয়ে থাকিস। নিয়ে চললি কদ্দূর ?

বাড়ি এইটাই, এই কম্পাউণ্ডের ভিতরে। কম্পোজিটারকে তা বলে কি বাবা দালানকোঠায় থাকতে দেবে ?

লতাপাতার মধ্যে জীর্ণ কয়েকটা টিনের খোপ। হরিবিলাস অবাক হয়ে বলেন, এই বাসা ?

বিনয় সোৎসাহে বলে, কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার জোটি নেই। কত কায়দা-কৌশল করে ঢেকেঢুকে আমাদের জন্য বাসা তৈরি করে রেখেছে, দেখ।

হরিবিলাস বলেন, তোর মাকে বাসায় আনতে বললি, লম্বা নেমন্তন্ন দিলি তো আমাদের সকলকে। এনে তুলতিস কোথায় শুনি ?

আসবে না তোমরা, সেটা জানতাম। মায়ের ঐ রকম অবস্থায় আসার তখন উপায় ছিল না।

এতক্ষণ বিনয় হাসির সুরে বলছিল। বলতে বলতে কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে আসে : দুঃখিনী মা আমার তবু তো জেনে গেলেন, ছেলে লায়েক হয়েছে, ভাল বাসায় আরাম করে আছে। তুমিও বাবা চিরকাল তাই জেনে বসে থাকতে রেল-স্টিমার করে শহরে এসে যদি না পড়তে। কিন্তু কি ব্যাপার বল দিকি, হঠাৎ এই রকম ভাবে এসে পড়া ?

সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক এখন, পরে শোনা যাবে। ঘরে ডাব পাড়া আছে, এই বাগানের ডাব। হাত-পা ধুয়ে ডাব খেয়ে ঠাণ্ডা হও। একদৌড়ে আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

একা ঘরে হরিবিলাস বারম্বার এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখেন। আর মনে মনে ভাবেন, সেই বায়ুভূত অবস্থায় জ্ঞানদা ভুলেও যেন এদিকে না এসে পড়েন! না চিনতে পারেন যেন বিনয়ের এই বাসা!

বিনয় রান্না করল। ফটকের পাশে চায়ের দোকান করেছে, রঘুমণি তার নাম। উনুন ধরিয়ে মশলা বেটে পুকুর থেকে জল তুলে সে-ই সমস্ত যোগাড় করে দিল। বাপ-ছেলে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। খেতে খেতে কথাবার্তা।

হরিবিলাস বলেন, এই খাটনির পরে আবার কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে রান্না! বিনয় বলে, দুটো চাল ফুটিয়ে নেওয়ায় কষ্ট কি বাবা? রঘুমণিই তো আর সব করে দিল।

হরিবিলাস বলেন, তাই বা কেন? মেস-টেস দেখে নিস একটা।

বিনয় বলে, শহর এদিকে এখনো গড়ে ওঠেনি। মেস-হোটেল বেশি নেই। থাকলেও খরচা অনেক।

বিরক্ত কণ্ঠে হরিবিলাস বলেন, পেটে খাবার খরচটাও দেবে না তোর মনিব? এদিকে বলিস পেয়ারের মানুষ।

বিনয় বলে, খরচা কি আর পাইনে? জমাচ্ছি টাকা। রঞ্জিত রায় সত্যিই কিছু সুনজরে দেখেন। প্রেস তিনি রাখবেন না। বললেন, টাকা জমিয়ে যাও। যদ্দূর পার নগদ দিও, বাদবাকি কাজের মুখে মাসে মাসে দিয়ে যাবে। টাকা শোধ হয়ে গেলেই পুরো মালিক। সেই চেষ্টা করছি বাবা। সত্যিই তো কম্পোজিটার হয়ে চিরকাল চলবে না। মনিবও সেই কথা বলেন, বলে বলে কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন টাকা জমাবার।

হরিবিলাস প্রশ্ন করেন, জমল কত ?

বেশি নয়। চার-শ'র মতো হয়েছে। পাই তো সামান্য, এর বেশি হবে কি করে ?

গম্ভীর হয়ে হরিবিলাস ঘাড় নাড়লেন : এতে হবে না তো আমার। তারপর সোজাসুজি বলেন, টাকার দায়ে এসেছি তোর কাছে। ঐ চারশ'র উপর আরও হাজার খানেক চাই।

সবিস্ময়ে বাপের দিকে চেয়ে বিনয় বলে, সে কি, অত টাকার কী দরকার পড়ল ? আমিই বা পাব কোথায় ?

আমি যে নিরুপায় হয়ে এসে পড়েছি বাবা। বড্ড আশা নিয়ে এসেছি।

ভাত খাচ্ছেন, এঁটো হাত—হরিবিলাস নয়তো ছেলের হাত জড়িয়ে ধরতেন ঠিক। বলেন, চিঠিতে তুই লম্বা লম্বা লিখতিস, আশা তাই আমাদের কলাগাছের মতো ফুলে উঠল। দায়ে পড়লে তোর কাছ থেকে পাব, সেই ভরসায় দু-হাতে খরচ করলাম তোর মায়ের চিকিচ্ছেয়। আর গেরো এমনি, নিকাশ দেওয়ার রেওয়াজ বছরে একবার—চোত্তের সালতামামির পর। পৌষ-কিস্তির আদায়টা হয়ে গেলে হাঙ্গামা ছিল না, স্বচ্ছন্দে তবিল পূরণ করে রাখতাম। তা এখন সম্পত্তি কেনার ভূত চেপে পড়ল মেজরাজার ঘাড়ে।

আদ্যোপান্ত ঘটনা বললেন। প্রজা ডেকে ডেকে মুকাবেলা করবে। খাজনা দিয়ে গেছে, সে টাকা হরিবিলাস খরচ করে ফেলেছেন, খাতায় জমা হয়নি। মুকাবেলার মুখে তবিল-তছরূপ ধরা পড়ে যাবে। চিরকাল সুনামের সঙ্গে কাজ করে বুড়োবয়সে এই পরিণাম। এর চেয়ে সোজাসুজি যদি জেলে পাঠাত, এতদূর ডরাতাম না।

বিনয় একটু ভেবে বলে, গাঁয়ে আর না-ই ফিরে গেলে বাবা—এখানেই থাক আমার সঙ্গে। দেশ দু-ভাগ হয়ে গেছে, টেনেহিঁচড়ে তোমায় সোনাটিকারি নিয়ে যাওয়া এখন আর সহজ হবে না।

তবু চোর বলবে ইতরভদ্র সকলে। মিছে কথাও নয়। সে আমি ভাবতে পারিনে বিনয়, ভাবতে গেলে পাগল হয়ে উঠি।
হরিবিলাসের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁ-হাত চোখের উপর দিয়ে বারম্বার জল মুছছেন। বিনয় স্তব্ধ হয়ে ছিল। সহসা বলে উঠল, খেয়ে নাও বাবা। হবে উপায়। যে অপরাধ তুমি করে বসে আছ, আমিও তাই করব—তবিল-তছরুপ। বড়বাবু আমায় বড্ড বিশ্বাস করেন। প্রেসের বিল আদায় হয়ে পড়ে থাকে, ভবানীপুরে ওঁদের বাড়ি গিয়ে খাতাপত্রে জমা করে দিয়ে আসি। আমার নিজের না থাক প্রেসের টাকা আছে, তাই তোমায় দিয়ে দেব।
হরিবিলাস প্রবোধ দিচ্ছেন: নির্ভয়ে তুই দিয়ে দে। পৌষমাসে আমি কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত দেব। সালতামামির নিকাশের সময় যদি কিছু ঠেকা পড়ে, তখন আবার নিয়ে নেব। আমাদের বাপ-বেটার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চলবে, বাইরের কেউ কিছু টের পাবে না।

হরিবিলাস সোনাটিকারি ফিরে গেলেন। রঞ্জিত রায় কলকাতায় নেই এখন, পাটনায়। ক'দিন আর থাকেন কলকাতায়! প্রেসের নেশা গিয়ে বড় ব্যবসায়ে মেতেছেন কিছুকাল থেকে। কলিয়ারির বন্দোবস্ত নিয়েছেন। কোম্পানির নাম হয়েছে জয়ন্তী কোল-কনসারন। শুরুতেই কতকগুলো বড় মামলা একটা কলিয়ারির স্বত্বাস্বত্ব নিয়ে। ছুটোছুটির অন্ত নেই। যত গোলমাল, ততই যেন মজা পেয়ে যান রঞ্জিত রায়।
একদিন শোনা গেল, ফিরেছেন বড়বাবু। হন্তদন্ত হয়ে বিনয় ভবানীপুরের বাড়ি গিয়ে পড়ে। রঞ্জিত আর ম্যানেজার পুলিনবিহারী—দুজনে মামলার কথা বলছেন। বিনয়কে দেখে রঞ্জিত বিরক্ত হন: এই এক চোতা প্রেস হয়েছে, নিত্যিদিন তাই নিয়ে মহাভারত শোনাবে। বল, আবার কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও, জরুরি কাজ আমাদের।

থতমত খেয়ে বিনয় বলে, প্রেসের কথা নয়, আমার নিজের কথা। প্রেসের বিলের টাকা আমি খরচ করে ফেলেছি।
রঞ্জিত খিঁচিয়ে ওঠেন : বড় কীর্তি করেছ। ট্রামভাড়া দিয়ে জাঁক করে শোনাতে এসেছ তাই।
বিনয় বলে, এ তো চুরি। চুরির কথা না বলে পারলাম না আপনাকে। যে শাস্তি দেবার দিন, মাথা পেতে নেব।
রঞ্জিন মুহূর্তকাল বিনয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। মুখে কৌতুকের হাসি। বলেন, অত করে চাইছ যখন, শাস্তি না হয় দিচ্ছি। কিন্তু কাঁপছ কেন তুমি এত? দুনিয়ায় তুমিই কি প্রথম মানুষ যে চুরি করল? ছোঃ!
তারপর জেরা আরম্ভ হল : আমি তো কখনো হিসেবপত্তর নিতে যাইনে, আগ বাড়িয়ে বলতে এলে কেন শুনি? স্বচ্ছন্দে চেপে যেতে পারতে।
বিশ্বাস করে আমার উপর ভার দিয়েছিলেন। সে বিশ্বাসের আমি মর্যাদা রাখিনি বড়বাবু।
সে তো কেউ রাখে না। নতুন ব্যাপার কিছু নয়। আমার মামাতো ভাইকে বিশ্বাস করে রাখালবাড়ি-কলিয়ারির ভার দিয়েছিলাম। হাজার দশেক টাকা মেরে আগের মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে মামলা লড়ছে এখন আমার সঙ্গে। এই প্রেসের আগে বাগানবাড়িতে জয়ন্তী-কার্ডবোর্ড-ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি করেছিলাম, তার আগে হ্যারিকেন-লণ্ঠন তৈরির কারখানা। টাকা মেরে দিয়ে সবাই তো পালিয়ে যায়, তুমি এমন সৃষ্টিছাড়া হতে গেলে কেন?
বিনয় চুপ করে থাকে। রঞ্জিত পুলিনবিহারীর দিকে চেয়ে বলেন, কি করব, বল হে ম্যানেজার।
পুলিন বিনয়কে ভাল চোখে দেখে না। মনিবের সুনজর যার উপর, কে তাকে পছন্দ করে?

কি করা যায় ছোকরাকে নিয়ে ?

পুলিন বলে, এমন অসৎ লোক প্রেসে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না।

রঞ্জিত লুফে নিলেন কথাটা : শুধু অসৎ নয়, অপদার্থ। শোন বিনয়, প্রেসের কাজ থেকে তোমায় বরখাস্ত করলাম। প্রেসই ছেড়ে দিচ্ছি, এত ঝামেলা আমার পোষাবে না। আগের মালিক আমার সেই বন্ধু কিছু নগদ টাকা দিতে চাচ্ছে। তারই তো প্রেস, আমি তাকে করে দিয়েছিলাম—যেখানে খুশি সে প্রেস তুলে নিয়ে যাক।

বরখাস্তের হুকুমে প্রীত হয়ে পুলিন বলে, যে টাকাটা বিনয় মারল, তা-ও নিশ্চয় আদায় হওয়া উচিত।

ঠিক, ঠিক। বরখাস্ত শুনেই অমনি দেশেঘরে পালাবে, সেটা হবে না বিনয়। পুলিনের আমাদের সকল দিকে দৃষ্টি। টাকা যদ্দিন শোধ না হচ্ছে, জায়গা ছেড়ে নড়তে দিচ্ছিনে। যেমন আছ, থেকে যাও। বাগানবাড়ির দেখাশোনা কর। আরও চারখানা বাড়ি আছে, সেগুলো দেখ। মাইনে যা আছে তাই। দশ টাকা করে কেটে নিয়ে মাসে মাসে দেনাশোধ হবে। আরও একটা মতলব করছি। প্রেস সরে গেলে ওখানে বিস্কুটের কারখানা করব। রাস্তার ওপারে ডেভিড সাহেবের ফ্যাক্টরি, আমাদের ফ্যাক্টরি এপারে। পাল্লাপাল্লি চলবে। তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে বিনয়, তোমার উপর ভার। পারবে না ? এদ্দিন ছাপার কালি মেখে ভূত হতে, এ তো বাবুভেয়ের কাজ হে !

ভাবখানা, বিনয় ঘোরতর প্রতিবাদ করছে, তারই বিপক্ষে লড়ছেন যেন রঞ্জিত রায়। মতলবটা প্রকাশ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগলেন। এই এক বিচিত্র ভাবের মানুষ।

বিনয় বিদায় হয়ে গেলে পুলিন বলে, এতবড় জোচ্চুরিটা করল, সত্যি সত্যি দায়িত্ব দেবেন তার উপরে ?

রঞ্জিত বলেন, আবার অঙ্কটাও দেখ। না বলে দিলে কোনদিন

আমি প্রেসের বিলের ঐ টাকা ধরতে যেতাম না। ছোকরা যেমন সাধু, তেমনি জোচ্চোর। হুয়ের মিশাল। কলিয়ারি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, তার উপর ফ্যাক্টরির খুঁটিনাটি কতদূর দেখতে পারব কে জানে? ছোকরার মাথায় পোকা আছে—কোন রকম গোলমাল ঘটালে ট্রামভাড়া করে নিজে এসে সেটা বলে যাবে। তা ছাড়া ভাল মাইনের কাজ না দিলে দেনাটাই বা তাড়াতাড়ি শোধ হয় কি করে?

॥ সাত ॥

মেজরাজা যা করলেন তা-ও কম নাটকীয় নয়।

গড়ভাঙা গাঁতি নিলামের তারিখ সঠিক ভাবে জেনে ডিক্রিজারির যাবতীয় ব্যবস্থা সেরে হরিবিলাস সদর থেকে ফিরে এলেন। মেজ-রাজা বলেন, আজ তুমি ক্লান্ত আছ, আজকে থাক। কালও পারব না—আমার নিজের আলাদা একটু কাজ আছে। পরশুদিন হিসেবপত্তর নিয়ে বসব।

বলছেন, আর সতর্ক দৃষ্টিতে হরিবিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাহর করছেন। ভাবভঙ্গি ভালই।

তৃতীয় দিন কাছারি-দালানে ঢুকে অশ্বিনী বলেন, কি হরি, বসবে নাকি এখন? তোমার দিক দিয়ে কিছু বাকি থাকে তো কাল বা পরশু থেকেও বসা যেতে পারে।

সময় দিচ্ছেন। হাতচিঠেয় নাম আছে বড় কম নয়। কড়চাখাতায় অতগুলো নাম তুলে ফেলে যথারীতি জমাখরচ করবে বেচারী। তাতে কিছু সময় লাগে।

হরিবিলাস বলেন, এখনই বসুন। গাঁতির নিলামের দিন ঘনিয়ে এল। ঘরের সম্বল বুঝে নিয়ে তারপরে যদি দরকার হয়, বাইরে চেষ্টা করতে হবে।

বোঝা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত খাজাঞ্চি হরিবিলাস। তবিলের যা ঘাটতি ছিল, পূরণ হয়ে গেছে। ঠিক এই জিনিসটাই মেজরাজা চেয়েছিলেন। চেপে বসলেন হরিবিলাসের পাশে ফরাসের উপরেই। হেসে বলেন, 'কয় শুভঙ্কর মজুত গোনো'—নগদ কি আছে সেইটে সকলের আগে। আয়রনসেফ খোল দিকি, খাতার কাজ পরে।

টাকাকড়ি গণেগেঁথে দেখা হল। ক'দিন আগে রাত্রিবেলা বাপে-ছেলেয় দেখে গেছেন, তার চতুর্গুণ। খাতার হিসাব নিয়ে অতএব তাড়াতাড়ি নেই, সেখানেও ঠিক ঠিক এই দাঁড়াবে।

মেজরাজার মুখ হাসিতে ভরে গেল। এত কাল হরিবিলাসকে দেখে আসছেন, চরিত্র-বিচারে ভুল হয়নি। টাকাকড়ি সিন্দুকের যথাস্থানে তুলে রেখে মেজরাজা বললেন, চাবি দাও হরি, বন্ধ করে ফেলি। খাতাপত্তর সব ফরাসের উপর নামিয়ে ফেল এইবারে।

হরিবিলাসের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মেজরাজা আয়রনসেফ বন্ধ করলেন। ফেরত দিলেন না চাবি, নিজের ফতুয়ার পকেটে ফেললেন। হরিবিলাস ওদিকে খাতাপত্র নামিয়ে এক জায়গায় করছেন।

মেজরাজা আঁতকে ওঠেন: ওরে বাবা, অত খাতা ঠায় বসে দেখতে পারব না তো। এক কাজ কর চূড়ামণি, ওগুলো আমার দোতলার ঘরে রেখে আয়। শুয়ে বসে সুবিধা মতন আস্তে আস্তে দেখব।

হরিবিলাস গোছগাছ করে খেরোর দপ্তরে বেঁধে দিলেন সমস্ত। চূড়ামণি ভিতরবাড়ি নিয়ে চলল।

আশিসের দিকে তাকালেন একবার মেজরাজা। সে এসে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, সিন্দুকের চাবি আমার নিজের পকেটে রেখেছি, লক্ষ্য করেছ বোধ হয় হরি?

লক্ষ্য হরিবিলাস ঠিকই করেছেন। ভেবেছিলেন, অন্যমনস্ক হয়ে রাখলেন, যাবার সময় দিয়ে যাবেন।

মেজরাজা বলেন, চাবি আর তোমায় দেব না। দরকারি কাগজপত্র ভিতরবাড়ি কেন পাঠিয়ে দিলাম, তা-ও এবারে বুঝে দেখ।

হরিবিলাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বললেন, ব্যাপারটা কি ?

ঘরের মধ্যে আরও যে একটি মানুষ রয়েছে, এতক্ষণ তা জানা যায়নি। আশিস দাঁতে দাঁত চেপে ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। আর পারে না। বলে উঠল, ন্যাকা সাজবেন না খাজাঞ্চি-কাকা। পুরানো কর্মচারী আপনি, আমাদের অবস্থা অজানা নেই, একটা টাকা এখন এক মোহরের সমান। এতদিন ধরে নুন খেয়ে আপনি আমাদের সর্বনাশ করছিলেন।

হরিবিলাসের মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। অশ্বিনী ছেলেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন : আঃ আশিস, কী সব বলছ! কাকা বলে ডাক না তুমি ?

সঙ্গে সঙ্গে হরিবিলাসের দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, ছেলেমানুষের আজেবাজে কথায় কান দিও না হরি। বিষয়সম্পত্তি সমস্ত প্রায় গেছে। এতজন আমলার মধ্যে একলা তুমি ছিলে শেষ পর্যন্ত। ধরে নাও, তা-ও রাখবার সামর্থ্য নেই আমাদের। দরকারও নেই। ছিটেফোঁটা যা আছে, বাপ-বেটা আমরা নিজেরা দেখতে পারব। লোকে অন্তত তাই জানুক। পুরানো লোক বরখাস্ত করে দিচ্ছি, এটা ভাল দেখাবে না। আমাদের ভিতরের ব্যাপার যা-ই হোক, লোকে কেন তা টের পাবে ?

হরিবিলাস আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বয়সে আপনি আমার বড়। একটা প্রণাম করে যাই মেজরাজা। বয়স হয়ে গেছে, প্রণাম করবার মানুষ তো খুঁজে পাইনে। আপনি একজন শুধু ছিলেন—আবার কবে দেখা হয় না হয়—হয়তো বা এই শেষ প্রণাম।

মেজরাজা বলেন, দেখা না হবার কি—কোয়ার্টার ছাড়তে বলছি নে। ওখানেই থাক তুমি।

প্রবোধের সুরে পুনশ্চ বলেন, গড়ভাঙার গাঁতির নিলাম ডাকব। দাঁও মতো নতুন নতুন সম্পত্তি করার ইচ্ছে। সম্পত্তি বাড়লে লোকেরও দরকার হবে। পুরানোদের না নিয়ে তখন কি আর নতুন লোক ডাকতে যাব? যেমন আছ, তেমনি থেকে যাও হরি।

হরিবিলাস বলেন, আজ্ঞে না। গাঁয়ের মধ্যে আমি মুখ দেখাব কি করে?

গাঁয়ের মানুষ জানবে কিসে?

আপনি জেনেছেন, খোকাবাবুও জানে। আপনাদের নজরের মধ্যে পড়ি, তেমন জায়গায় থাকতে পারব না রাজাবাবু। পারি তো আজই—নয় তো কাল আমি চলে যাচ্ছি।

অশ্বিনী বলেন, ছেলের কাছে যাবে?

হরিবিলাস ঘাড় নাড়লেন: না, তারও সর্বনাশ করে এসেছি। প্রাণপাত খেটে ভবিষ্যৎ গড়ছিল, বাপ হয়ে সে পথে কাঁটা দিয়ে এসেছি। ছেলের কাছেও মুখ দেখাবার উপায় নেই রাজাবাবু।

গলা ধরে এল। সামলে নিয়ে বলেন, জামাই আছে নাতি-নাতনিরা আছে, আপাতত সেখানে গিয়ে উঠিগে। মেয়ে মরে গেছে, কতদিন থাকা যাবে জানিনে। গোটা পিরথিম তার পরে পায়ের নিচে পড়ে রইল।

আশিসকে কাছে ডেকে অশ্বিনী ফিসফিস করে বলেন, গোস্তি-নৌকো একটা আড়াআড়ি ভাড়া করে ফেল। ত্রিভুবন তোমার তো জানাশোনা। নেয়েরা খুব বিশ্বাসী হবে, খবরটা চাউর করে না দেয়। কৃষ্ণপক্ষ আছে, ভালই হয়েছে—আঁধারে আঁধারে মালপত্তর বোঝাই হতে পারবে।

আশিস অবাক হয়ে বলে, মাল যাবে কোথায় বাবা?

অন্য সকলের যেখানে যাচ্ছে। আমি কি সৃষ্টিছাড়া একটা-কিছু করতে যাব ?

মালপত্তর সরিয়ে দেবেন ? এদিকে আবার নতুন সম্পত্তির জন্যে দরাদরি করছেন।

মেজরাজা নিরীহ ভাবে বলেন, তা ছাড়া কি করব ? বলে বেড়াব, টাকাকড়ি কুড়িয়েবাড়িয়ে নিচ্ছি হিন্দুস্থানে চলে যাব বলে ? আনসার-বাহিনী তড়পাচ্ছে, কাউকে যেতে দেবে না—আমি তার ডবল জোরে বলি, কক্ষনো না, কিছুতে না, মরে যাক তবু যেন ভিটে ছেড়ে কেউ না নড়ে। সেই জন্যে দেখ, সকলের উপরে চরবৃত্তি করে বেড়ায়, দলের মানুষ ভেবে আমার সম্বন্ধে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত।

আশিস বলে, মালপত্তর চলে গেলে তখন তো আর বুঝতে বাকি থাকবে না।

মেজরাজা হাসেন : তা বুঝবে বটে ! বুঝে তখন দন্ত-কড়মড়ি করবে, আর ঘরের ভাত বেশি করে খাবে। মাল ভাসল গোস্তি-নৌকোয়—তার মধ্যে ঠাঁই করে নিয়ে আমরাও গোটাকয়েক বাড়তি মাল হয়ে বসে পড়লাম। পাবে কোথায় তখন আর আমাদের ?

কিছু পাকা-বুদ্ধি ছাড়েন এবার ছেলের উদ্দেশে : শোন, ধনুকের বাণ যেদিকে ছুঁড়বে টানতে হয় তার উল্টোমুখে। যত বেশি পিছন দিকে টান, বাণ তত জোরে ছুটবে। সংসারের ব্যাপারেও ঠিক তাই। কলকাতা পালানোর কায়দা এই দেখছ, আর হরিবিলাসের ব্যাপারটাও দেখেছ আগে। তুমি ভেবেছিলে, পুরানো লোক বলে দয়া করছি। বৈষয়িক লোক দয়া কাউকে করে না। তোমার কথা মতো থানা-আদালত করে হরিবিলাসকে হয়তো জেলে ঢোকানো যেত, কিন্তু এতগুলো টাকার একটি পয়সাও আদায় হত না ওর কাছে থেকে। ভাল করেছি কিনা বুঝে দেখ এবারে।

সদাশিব দাবা খেলতে এলে অশ্বিনী চুপি চুপি বলেন, চললাম এবারে শিব-দাদা। বন্দোবস্ত সারা—শুধু পাঁজির একটা দিনের অপেক্ষা।

সদাশিব এক কথায় বলেন, আমিও যাব।

সে কি ?

তোমরা যদি না যেতে তবুও চলে যেতাম।

কিন্তু যাবে কি করে ? পা ধরে তোমার ছাত্রেরা টিপঢাপ পায়ের উপর আছড়ে পড়বে যে !

সদাশিব বলেন, সেই আফজল কাল এসেছিল। সত্যি সত্যি সে পা জড়িয়ে ধরতে যায় : মাস্টারমশায়, যান চলে আপনি, দেরি করবেন না। রবিবার হাটের সময় নানান জায়গার মানুষ এসে জড় হবে, একটা কাণ্ড হতে পারে সেই দিন। আফজল এইসব বলে, আর হাউহাউ করে কাঁদে।

তারপর বলেন, খবরের-কাগজ দেখে থাক মেজরাজা ? লিখছে কি আজকাল ? বর্ডারের ওপারেই বা খবর কি ?

মেজরাজা বলেন, কাগজ কোথা পাব ? স্টিমারঘাট অবধি গিয়ে কাগজ ধরতে আর ইচ্ছে হয় না। গরজটাই বা কি—যা করব সে মনে মনে ঠিক আছে। অনেক দিন থেকেই আছে, বাইরে কেবল বলিনে। গুছিয়ে নিতে দেরি হচ্ছিল। আশিসও অনেক দিন কলকাতা যায়নি। এইবারে সর্বশেষ দল নিয়ে যাওয়া।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলেন, আর ফিরব না আমরা কেউ।

দাবাখেলা সেদিন আর হল না। সদাশিব বলেন, যাওয়ার তাড়া, খেলার চাল আর মাথায় আসবে না। পায়ে পায়ে স্টিমারঘাটে চলে যাই। কাগজ কিনতে না পারি, পড়ে আসি ওখান থেকে।

বাড়ির মধ্যে বিরজার কাছে অশ্বিনী কথাটা বলেন : আর কি দিদি, রাজবাড়ির মায়া কাটাও এবারে। আর আসব না এবাড়ি।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন : দিদি, জন্ম থেকে গাঁয়ের

উপর মানুষ। বাইরের কিছুই জানলাম না এই সোনাটিকারির মাটি আর মানুষজন ছাড়া। শুধুমাত্র এক কাঠা ভুঁই নিয়েও কত মামলা-মোকদ্দমা লড়েছি। সব পড়ে রইল। পথে বেরুচ্ছি পরশুদিন—পথের আর দশটা মানুষ যা, সোনাটিকারির রাজামশায়ও তাই।

বল কি! বিরজা অবাক হয়ে গেলেন: নিতান্ত যদি বেরুতে হয়, বাঁশির বিয়েথাওয়ার পরে—এই তো বলে এসেছ তুমি।

অশ্বিনী বলেন, আরও কত কি বলেছি, সব এখন মনে পড়ছে না। বৈষয়িক লোকের কথা ধরতে নেই। বলি, বিয়ে যে দেব, পাত্র পাই কোথা? ভাল পাত্র নেই আর এ তল্লাটে—বর্ডার পার হয়ে বেরিয়েছে। আছে হেজে-যাওয়া পোকায়-খাওয়া ছুটো-একটা—তিন কুলে যাদের কেউ নেই। বাঁশির মতো মেয়ে তেমন পাত্রে দেব না। মেয়ের বিয়ে ওপারে গিয়ে ধীরে-সুস্থে দিও দিদি।

বাঁশির মতো মেয়ে নিয়ে পথে বেরুনো—তুমিই তো বরাবর ভয় ধরিয়ে এসেছ।

মেজরাজা বলেন, পথে বেরুনোই বেশি নিরাপদ দিদি। বাড়ির মধ্যে বরঞ্চ ভয়, কখন কারা হামলা দিয়ে এসে পড়ে। স্টেশনের উপর কিংবা গাড়ির ভেতর অত লোকের মাঝখানে কে কি করবে?

হেসে বলেন, সুবিধাই বরঞ্চ এক দিক দিয়ে। সুন্দর মেয়ে দেখে লোকে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দেবে। টিকিটের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়াতে হবে না, লাইনের মানুষ হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে টিকিট করে দেবে। মেয়েও আমাদের ডাংপিঠে। বাঁশিকে আগে ঠেলে দিলে সে-ই আমাদের সকলকে নিয়ে যেতে পারবে।

গোস্তি-নৌকোয় মালপত্রের সঙ্গে মিশাল হয়ে অশ্বিনীরা যাবেন। রাজবাড়ির মেজরাজা স্টিমারে, নিশিরাত্রি হলেও, যেতে পারেন

না। সকলের থেকে চিরদিন আলাদা। পালাবার মুখেও আলাদা হয়ে যাবেন তিনি—যতক্ষণ অন্তত দেশের সীমানার ভিতর রয়েছেন। নৌকার বিশ্বাসী দাঁড়ি-মাঝিরাও এখন অবধি জানে, চলে যাচ্ছেন শুধু দুজন মেয়েলোক—বিরজা আর বাঁশি। আর কিছু জিনিসপত্র। মাস্টারমশায় সদাশিব তাদের অভিভাবক হয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আশিস প্রকাণ্ড এক দল জুটিয়ে নিয়ে স্টিমারে যাচ্ছে। খুলনা স্টেশনে এঁদের সঙ্গে না-ও যদি দেখা হয়, শিয়ালদা পৌঁছে হবে।

দাঁড়ি-মাঝিরা জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে চলল। পিছনে লোক ক'টি। সকলের পিছনে অশ্বিনী। মাঝি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ঘাটে চললেন রাজাবাবু?

যাই, তুলে দিয়ে আসি—

তখন অবধি মেজরাজা হুঙ্কার ছাড়ছেন: যাদের খুশি চলে যাক—আমি ভিটে ছাড়ব না। মারুক কাটুক কিছুতেই না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকব এখানে।

জোয়ার লেগেছে। মাঝি বলল, নৌকো এইবারে ছাড়ি। নেমে যান রাজাবাবু।

চকিত ভাবে মেজরাজা জনশূন্য অন্ধকার ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বলেন, তাই বটে! রাখ একটুখানি মাঝি। নামি। নামতে নামতে বলেন, ছেড়ে দিও না। আসছি আবার।

নেমে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী দুমদুম করে পাগলের মতো ঘাটের মাটির উপর লাথি মারেন। থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলছেন: পুড়েজ্বলে যাক। যেখানে আমরা থাকতে পারলাম না, বন্যায় ভাসুক, ঝড়ে উড়ে যাক। থুঃ-থুঃ!

সদাশিবও পিছন পিছন নেমেছেন। দু-চোখ বিস্ফারিত করে চিরদিনের গম্ভীর-স্বভাব মেজরাজার এই কাণ্ড দেখছেন। অশ্বিনী উঠে পড়লেন আবার নৌকোয়। সদাশিব তখন একটু মাটি তুলে

চাদরের কোণে যত্ন করে বাঁধলেন। বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতন বলেন, যারা সব রইল, ভাল কোরো তাদের ঠাকুর। ক্ষেতে ধান হোক, গাছগাছালিতে ফল হোক, ভাল হোক মানুষের।

॥ আট ॥

সোনার বরণ খড়ে-ছাওয়া কত ঘর দুই তীর জুড়ে। গোবরমাটি-নিকানো তকতকে ঝকঝকে কত আঙিনা। মাঝে মাঝে দালান-কোঠা দু-একটা। কত বাগবাগিচা পুকুরঘাট হরিতলা-কালীতলা। নৌকো চলেছে সমস্ত পিছনে ফেলে। নৌকোর নিচে জলস্রোত কাঁদতে কাঁদতে সারা পথ সঙ্গে চলে।

তারপর খুলনা। রেলগাড়ি খুলনা থেকে কলকাতায় এনে ফেলল। শহর কলকাতা। টাকাকড়ি জিনিসপত্রের অধিক ঝামেলা নেই আর এখন, নৌকো বোঝাই করে এনেছিলেন, বর্ডারে পুলিস দয়া করে প্রায় সমস্ত হালকা করে দিয়েছে। দিনকে-দিন আইনের কড়াকড়ি। যারা কায়দাকানুন জানে, তারা কিন্তু অবাধে বেরিয়ে যায়।

সূঁচ গলতে দিচ্ছে না, এত মালপত্র কেমন করে নিয়ে এলে হে?

ব্লাকে নিয়ে এসেছি।

নতুন একটা কথাই চালু হয়েছে 'ব্লাকে যাতায়াত'। আশিসটা দলবল নিয়ে আলাদা চলে গেছে। এত বারের আসা-যাওয়া, কোন তদ্বিরে পুলিশ সামলাতে হয়, নিশ্চয় সে জানে। সে থাকলে খানিকটা বন্দোবস্ত হতে পারত। কিন্তু গ্রাম-অঞ্চলের পাটোয়ারি ব্যক্তি অশ্বিনী কাস্টমসের ধমকানিতে দিশাহারা হয়ে পড়ছেন, তোতলা হয়ে গেছেন কেমন যেন। থান-কাপড়ের লম্বা ঘোমটা টেনে বিরজা ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে একদিকে সরে দাঁড়িয়েছেন। লোকগুলো বারম্বার বাঁশির দিকে তাকায়—আতঙ্কে অশ্বিনী ঘেমে

উঠছেন ততই। মাস্টারমানুষ সদাশিব তারই মধ্যে গিয়ে বাপু-বাছা করছেন। কিন্তু কাজ হয় না।

বাঁশি ফরফর করে এগিয়ে গেল: হয়েছে কি বলুন তো, এত কড়াকড়ি কিসের? চিরকালের মতো যাচ্ছি চলে। ঘরবাড়ি জমিজমা কিছু নিয়ে যাচ্ছিনে। সামান্য তুটো চারটে জিনিস—একেবারে নিঃসম্বল অথই-সমুদ্দুরে গিয়ে পড়ি, তাই কি চান আপনারা?

ছোকরা গোছের একজন বলে, যাচ্ছেন কি জন্যে নিজের দেশভুঁই ছেড়ে? যেতে কে বলেছে? যাওয়া তো অন্যায়।

বাঁশি তীব্রস্বরে বলে, শখ করে কেউ চলে যায় না। পাঁচ পুরুষের বসত আমাদের—কোন কালে কেউ যাবার কথা ভাবেনি। চিরকাল পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে ঘরে থাকবে, তেমনি ভাবেই সংসার গুছিয়েছে। তবু যেতে হচ্ছে, নিশ্চিন্ত হয়ে আগের মতন থাকতে পারছিনে বলেই। কিন্তু সে তুঃখ আপনাদের বলে কি লাভ? দৈত্যের মতন রাষ্ট্রযন্ত্র, আপনারা তার নাটবল্টু বই তো নয়। যন্ত্রে মানুষ পেশাই হচ্ছে, আপনারা রুখবেন কেমন করে? তু-দশজনে তা পারে না।

ছোকরা বলে, ঠিক তাই। আইন করে দিয়েছে, সেই আইন খাটান কাজ আমাদের। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তার উপর রুপোর বাসন সোনার মোহর—আপনাদেরও আটক করে কোর্টে হাজির করা উচিত—

বাঁশির ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলে, তার কাজ নেই, গাড়িতে উঠুন গিয়ে। চারজনের মোটমাট তু-শ টাকা—তার বেশি এক আধলাও নিতে পারবেন না। গায়ে গয়না-গাঁটি আছে, ও-সমস্ত তাকিয়ে দেখছিনে। বাকি সোনা-রুপো টাকাপয়সা সরকারে জমা রইল। রসিদ নিয়ে যান। মামলা করে ছাড়িয়ে নেবেন এর পরে।

বর্ডারে সমস্ত ফেলে সম্বলহীন এসে পৌঁছলেন। শহর কলকাতা, স্বপ্নের শহর। ছোট্ট বয়স থেকে বাঁশি কত গল্প শুনেছে কলকাতার, পা দিল সেখানে এই প্রথম। বিরজা একবার কলকাতায় গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। চুল পেকে বুড়ো হয়েছেন, সেই একবার-আসা কলকাতার গল্প আজও ফুরাল না। বাঁশির মনে পড়ে, বিরজার গা ঘেঁষে ছোট ছোট দু-খানা হাতে জড়িয়ে ধরে একফোঁটা মেয়ে আবদার করত, কলকাতার গল্প বল পিসি। সে এক অবাস্তব জায়গা—তাদের গ্রাম বা শহর-বন্দরের সঙ্গে কিছু মেলে না। গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানার বাঘ-ভালুক, মরা সোসাইটি, পরেশনাথের বাগান, লাটসাহেবের বাড়ি, গঙ্গার উপর নৌকো ভাসিয়ে তার উপরে পুল, সেই পুলের উপর অগণ্য গাড়িঘোড়া-মানুষ। অফুরন্ত আনন্দের কলকাতা। কিন্তু অতিশয় বিশ্রী। একটু বেসামাল হয়েছ কি গাড়ি ঘাড়ের উপর পড়ে চাপা দিয়ে চলে গেল। গুণ্ডা-বদমায়েসে টাকাপয়সা সরিয়ে নিয়ে ফতুর করে দিল, প্রাণহানিও করতে পারে।

সেই আজব শহরের প্রান্তে এনে রেলগাড়ি নামিয়ে দিল। শিয়ালদা স্টেশন। শহর বটে একখানা—কী বিষম হৈ-চৈ। এত লোক চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—বিরজার আজ কিন্তু ঘোমটা টেনে দিতে মনে নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তিরিশ বছর আগে দেখে গেছেন—কিন্তু এ যেন আলাদা এক জায়গা। এই এক ট্রেন এসে পৌঁছল, ঐ এক ট্রেন ছাড়ছে ওদিকে—এক দঙ্গল নেমে পড়ল, আর এক দঙ্গল ছুটেছে গাড়ি ধরার জন্ত। প্ল্যাটফরম ধরে এগিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ বেরুচ্ছে লোহার শিকের দরজা দিয়ে—ঢুকছে মানুষ ভিন্ন এক দরজায়। এলাহি কাণ্ডকারখানা। বেরিয়ে এসে দূরের দিকে তাকিয়ে বিরজা আরও অবাক: কত ঘরবাড়ি রে বাপু। যে দিকে তাকাই, শুধু ঘর।

বাঁশি আর কখনো কলকাতা আসেনি, তার কিন্তু বিস্ময় নেই।

হেসে বলে, অত ঘর পিসিমা, আমাদের জন্য ওর একটাও নয়।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বিরজা বলেন, ঘর নেই, তবে থাকব কোথায় আমরা ?

বাঁশি চারিদিকে আঙুল ঘুরিয়ে বলে, এই যে কত মানুষ রয়েছে—আমরা কেন থাকতে পারব না ?

স্টেশনে পা ফেলবার উপায় নেই। অগণ্য মানুষ সংসার জমিয়ে আছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে এই মেজরাজা অশ্বিনীর মতোই। একটা গোটা গ্রাম সাজিয়ে নিয়েছে যেন স্টেশনের উপর। গ্রামের এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে পগার কেটে বেড়া ঘিরে সীমানা চিহ্নিত করে—এ যেন অবিকল সেই বস্তু। যারা যতটুকু জায়গা জুটিয়েছে, পোঁটলাপুঁটলি বাক্সপেঁটরা বাসনপত্তরে ঘের দিয়ে নিয়েছে। ঐ পাঁচ বাই তিন হাত জায়গা যেন এক গৃহস্থবাড়ি। বাইরের মানুষ তুমি সেখানে গিয়ে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে টান, সুখদুঃখের খবরাখবর নাও, তারপর ফিরে যাও নিজের কোটে। সেই গৃহস্থ-বাড়ির বউটা সকালবেলা দুর্গা-দুর্গা—বলে ঘুম ভেঙে উঠে স্টেশনের কলে মুখ-হাত ধুয়ে এল। বাচ্চারা মুড়ি খাচ্ছে এনামেলের বাটির চতুর্দিকে বসে। অতি শৌখিন গৃহকর্তার জন্য চায়ের জল গরম করছে বউ তোলা-উনুন ধরিয়ে। বঁটি পেতে তারপর কোটনা কুটতে বসে গেল। কোটনা কুটছে, আর গল্প করছে পাশের গাঙুর মেয়েটার সঙ্গে। মাড়োয়ারিবাবু খিচুড়ি খাওয়াল—ছ্যা-ছ্যা, আসিদ্ধ ডালের ধরা-খিচুড়ি। সেবাশ্রম থেকে চিঁড়ে-মুড়ি বিলি করে যায়, অনেক ভাল সে জিনিস—কি বল ভাই, অ্যাঁ ?

বিরজা শিউরে ওঠেন : এমনি করে থাকতে হবে। এই রকম হাটের মধ্যে ?

বাঁশি সহজ ভাবে বলে, ঠিক পারব পিসিমা। এখন আমরা রাজবাড়ির মানুষ নই, এ জায়গা [illegible] নয়। [illegible]

মতন কত সোনাটিকারি রুপোটিকারির লোক এসে জমেছে স্টেশনে। এত লোকে পারছে, আমরা কেন পারব না ?

আশিসের দেখা মিলল এতক্ষণে। বড় দলটা নিয়ে সে আগের ট্রেনে পৌঁছেছে। স্টেশনের আচ্ছাদনটুকুর নিচে অতগুলো সংসার কোনখানে কি ভাবে পাতা যায়—জায়গা খোঁজাখুঁজি করছিল সে কয়েকজনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে পরের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। ট্রেনও যে আজ হঠাৎ সাহেবমানুষের মতো ঘড়ি ধরে চলাচল করবে, আন্দাজ করতে পারেনি।

বাঁশি বলে, আমাদেরও একটা জায়গা-টায়গা দেখ দাদা। বোঁচকা-বুঁচকির উপর বসে কতক্ষণ এমন কাটানো যায় !

ঘুরছে আশিস এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। যে ভাগ্যবানেরা আগে এসে গোটা স্টেশন ভাগাভাগি করে নিয়েছে, নিজের দখল থেকে তারা সূচ্যগ্র-পরিমাণ ছাড়বে না।

আশিসও নাছোড়বান্দা। এদিকে ঘুরছে, ওদিকে ঘুরছে। অনুনয়-বিনয় করছে কারও কাছে, কারও সঙ্গে বা ঝগড়া।

নাদুসনুদুস এক বুড়া ভদ্রলোক আশিসকে ডাকলেন : শোন হে ছোকরা, এদিকে এস। কি বলছ শুনি।

খাতির জমাতে আশিস সেইখানে উবু হয়ে বসে পড়ল।

এই স্টেশনে সকলের আদি-বাসিন্দা আমি। কি বলতে চাও, আমার কাছে বল। তখন দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছু নয়, ফিসফিস-গুজগুজ সবে কেবল শুরু হয়েছে—সাহস করে বউ-ছেলেপুলের হাত ধরে এসে পড়লাম। এসেছিলাম তাই রক্ষে। কেমন খাসা জায়গাখানা পেয়ে গেছি দেখ। এপাশে দেয়াল—দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙিয়ে নিয়েছি, কাপড়-জামা থাকে। সামনেটা একেবারে খোলা—ফুরফুরে দখিনহাওয়া। মশাটশা নেই, তা সত্ত্বেও বেয়াড়া অভ্যাস—মশারি বিনে ঘুম হয় না। চিরটা কাল ভাল খেয়ে ভাল

শুয়ে এসেছি তো। মশা নাই হোক, মশারি টাঙাতেই হবে আমায়। টাঙিয়েও থাকি রোজ। কী করে টাঙাই বল দিকি?

ঘাড় বাঁকিয়ে আশিসের দিকে রহস্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধ পা নাচাতে লাগলেন: কেমন করে, বল। তবে বুঝব এলেম আছে কিছু তোমার ঘটে।

আপাতত আশিসের এলেম দেখানোর ধৈর্য নেই। বুড়া ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, পারলে না তো? আমি বলে দিচ্ছি। দেয়ালের পেরেক দুটোয় মশারির দুই কোণ বাঁধি। তারপর এই পোর্টম্যাণ্টো, আর এই জলের কলসি—হয়ে গেল আর দুটো কোণ।

আশিস প্রশ্ন করে, মশারির কোণ জলের কলসিতে আর পোর্টম্যাণ্টোয়—বোঝা গেল না ঠিক।

বৃদ্ধ অধীর কণ্ঠে বলেন, কী আশ্চর্য, আরও বলতে হবে? পোর্টম্যাণ্টোর আংটায় আমার বেতের লাঠি খাড়া করে দিই। আর কলসির জল ঢেলে ফেলে তার মধ্যে দিই ছাতা। ছাতার বাঁটে মশারির এক কোণা, আর লাঠির মাথায় অন্য কোণা। হয়ে গেল না?

নিজের কথা অনেকক্ষণ ধরে বলে বৃদ্ধ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন: তোমার কথা বল, এইবারে শুনি। আমি আদিমানুষ, আমায় বললে সকলকে বলা হয়ে যাবে।

বাড়ির লোকদের দেখিয়ে আশিস বলে, এই সকালে এসে পৌঁছলেন। নিয়ে তুলি এখন কোথায়? সকলে একটু-আধটু সরে গিয়ে আমাদেরও যদি একটা সতরঞ্চি পাতবার জায়গা করে দেন—

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গণে নিলেন: এক দুই তিন চার—চারজন। তার উপরে তুমি। একুনে পাঁচ। পাঁচগাছি কুটো ফেল দিকি, মেজেয় পড়ে কি না। তুমি এর মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা গোটা মানুষ ঢোকাতে চাও।

আশিস সকাতরে বলে, এখন কায়ক্লেশে কোথাও বসতে পেলে সন্ধ্যে নাগাত ঠিক জায়গা হয়ে যাবে। যাবেও তো চলে কেউ কেউ।

কে যাবে? কোন আহাম্মক আছে, এমন জায়গা ছেড়ে চলে যাবে?

জমাট কথাবার্তা দূর থেকে দেখে অশ্বিনীর ভরসা হয়েছে। বাঁশিকে উসকে দেন: যা না তুই, দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়া। তুই গেলে তাড়াতাড়ি ফয়শালা হয়ে যাবে।

বাঁশি গেল। বৃদ্ধ কিন্তু তাকিয়েও দেখেন না, আগের কথার জের ধরে চলেছেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, এমন সুখ কোথা শুনি? পাকা-ঘরে আছি, সিকিপয়সা বাড়িভাড়া দিইনে। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় দুনিয়া উৎসন্ন হয়ে যাক, আমাদের গায়ে একফোঁটা জল লাগবে না। তার উপরে মচ্ছব তো লেগেই আছে অহরহ। আজ অমুক বড়লোক খাওয়াচ্ছেন, কাল তমুক সেবা-সমিতি খাওয়াচ্ছে—প্রায় দিন উনুন জ্বালাতে হয় না। রাজা সীতারামের সুখ বলে থাকে—সে বোধহয় এই।

বাঁশি বলে ওঠে, তা হলেও চিরদিন তো থাকতে দেবে না স্টেশনে—

হটায় কে? রয়েছি তো ছ-মাসের উপর। গর্ব ভরে বৃদ্ধ বলেন, মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে পড়ে: চলে যাও স্টেশন খালি করে দিয়ে। সরকারি লোক মানে হল রাজা, রাজবাক্যের উপর কথা বলতে নেই। ওরা বলে, উঠে যাও; আমরা বলি, যে আজ্ঞে। আবার এসে বলে, কই, গেলে না? বলি, যাব। ওরা বলে, এই এক কথাই বলছ তো কদ্দিন ধরে। আমরা বলি, রাজপুরুষের কাছে দু-কথা বলি কেমন করে?

হি-হি-হি করে হাসতে হাসতে ধপাস করে তিনি শয্যায় গড়িয়ে পড়লেন। পুলকের আতিশয্যে অতি দ্রুত পা নাচাচ্ছেন।

আর একজন এদের ডাকছেন অদূরের ঘেরের মধ্য থেকে : জায়গা চাই তো আমার কাছে চলে এস। এই দিকে।

আশিস কাছে গিয়ে বলে, সামান্য একটু জায়গা নিয়ে তো আছেন—এর থেকে কী দেবেন, আর আপনার নিজের কী থাকবে ?

বলতে গেলে গোটা পূব-বাংলা ঢুকে পড়েছে একখানা স্টেশনঘরে। ঘরখানা বড় অবিশ্যি, কিন্তু ঘর না হয়ে গড়ের মাঠ হলেও তো অকুলান পড়ত। 'যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় দশজন'। তা তেঁতুলপাতার চেয়ে অনেক বড় এই জায়গা, আর দশের অনেক কম তোমরা আমরা—দুই সংসার মিলে। কেউ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে আর কেউ অষ্টঅঙ্গ মেলে চিত হয়ে থাকবে—এটা হয় না। বিনি-পাপের দুঃখকষ্ট সকলের সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত।

বর্ষীয়সী বিপুলকায়া মহিলাটি শুয়েছিলেন। তাঁকেই ঠেস দিয়ে বলা। তড়াক করে উঠে বসে মহিলা দু-চোখে অগ্নিবর্ষণ করছেন পুরুষটির দিকে।

কথাবার্তা কিছু কিছু সদাশিবের কানে ঢুকেছে। তিনি বলেন, ভদ্রলোক নিজে থেকে যখন বলছেন—শোওয়া না হোক, বসতে তো পারব আপাতত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, তুমি আর 'না' বোলো না বিরজা-দিদি।

বিরজা ক্রমাগত ঘাড় নাড়েন। ফিসফিস করে বলেন, না, কক্ষনো না, ভাল নয় ও-লোকটা।

বাঁশি বলে, ভদ্রতা করে ডাকছে, সেই জন্তেই বুঝি খারাপ হয়ে গেল ?

বিরজা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, ভদ্রতা না কচু। ডাকছে তোকে, নজর তোর দিকেই কেবল। সেটা সোজাসুজি বলে কি করে, তাই সবসুদ্ধ ডাকছে।

বাঁশি বলে, আরও তো একজনের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম

পিসিমা। সে মানুষ আমল দিল না, তাকিয়েও দেখল না ভাল করে।

বিরজা বলেন, বুড়োথুথ্‌ড়ে মানুষ—চোখেই হয়তো ভাল দেখে না। আর দেখ এই লোকটার কাণ্ড, গিলে খাচ্ছে যেন ছুটো চোখ দিয়ে।

এদ্দিনে আমার কদর বুঝলে! বিরজার কথার ভঙ্গিতে বাঁশি হেসে ফেলে: সোনাটিকারিতে ঘরে পুরে রাখতে চাইতে পিসিমা। পাড়ায় এক পা বেরিয়েছি তো গালি দিয়ে ঝগড়া করে ভূত ভাগিয়ে দিতে। আজকে দেখ, আমারই জন্তে—আমায় বাইরে নিয়ে এসেছে বলেই সবসুদ্ধ হিল্লে হয়ে যাচ্ছে।

অতি সহজ ভাবে বাঁশি সেই মানুষটার মাছুরের প্রান্তে বসে পড়ে অন্য সকলকে ডাকছে: আসুন না মাস্টারমশায়। তোমরাও সব এস।

সেই বিপুলা মহিলা বলেন, মেয়ে একখানা বটে। উড়ে এসে জুড়ে বসল। আবার গুষ্টিসুদ্ধ ডাকাডাকি করে। আমরা তবে উঠে যাব নাকি?

বাঁশি বলে, রাগ কোরো না লক্ষ্মী মাসিমা। ট্রেনে সারা পথ আমরা বাছুড়ঝোলা হয়ে এসেছি। তোমরা সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছ। শুয়ে বসে বাত ধরে যাবে—যাও না, কলকাতা শহর দেখে এস একবারটি চক্কোর দিয়ে।

বলে বাঁশি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল একটু আগে মহিলাটি যেখানে শুয়েছিলেন। রাগে গরগর করে মহিলা পাক মেরে উঠে দাঁড়ালেন।

বাঁশি বিরজাকে ডাকে: ও পিসিমা, শোবে নাকি? জায়গা রয়েছে আমার পাশে।

বিরজা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

একটা রাত কোনক্রমে কাটল গুটিসুটি হয়ে। সকালবেলা বাঁশি আশিসকে বলে, জায়গা দেখ দাদা। এমন ভাবে থাকা যাবে না। আশিস বলে, আহা, তুই বলে দিবি, তবে যেন আমি জায়গা দেখতে বেরুব।
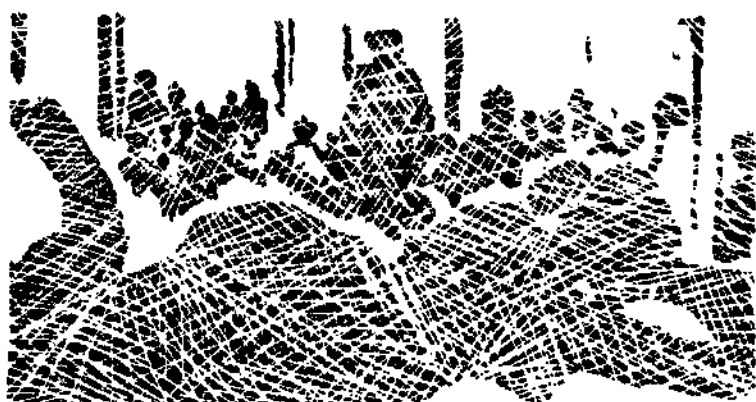
বাঁশি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল, একটু আগে মহিলাটি যেখানে শুয়েছিলেন

কলকাতায় পা দিয়ে আশিস সত্যি একটা বেলাও জিরোয় নি। জায়গার জন্য কাল দুপুরে বেরিয়েছিল। আর একবার রাত-দুপুরে অনেক মানুষ সঙ্গে নিয়ে। ফিরেছে ভোর হবার একটু আগে।

বাঁশির কথায় বিরজা টিপ্পনী কেটে উঠলেন : তবু ভাল। নিজের সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান কিছু হয়েছে মেয়ের।

বাঁশি বলে, থাকা যাবে না—সে কথা ঠিক নয়। থাকলে কে রুখছে? কিন্তু থাকা বোধ হয় উচিত হবে না।

আশিস বলে, কেন বল দিকি?

ভাইয়ের একেবারে কাছে এসে গলা নামিয়ে বাঁশি হেসে হেসে বলে, দেখ, তাকিয়ে দেখ দাদা, সবগুলো নজর তোমার হতচ্ছাড়ী বোনটার দিকে। গরবে বুক ফুলে ওঠে না, সত্যি করে বল। এই যত লোক ভিড় করে আছে, মেরে তাড়ালেও কেউ নড়বে না যতক্ষণ আমরা আছি এখানে। কিন্তু আমি ভাবছি আরও পরের কথা।

মুখে মুখে যত চাউর হবে, দলে দলে আরও সব এসে জুটবে। কাজকর্ম অচল হবে স্টেশনের। তেমনি অবস্থা হবার আগে সরে পড়া উচিত। দশের উপরে কর্তব্য আছে তো একটা।

॥ নয় ॥

কত দূর-দূরান্তর থেকে কত খাল-নদী মাঠ-গ্রাম পার হয়ে এসে পড়লাম গো তোমাদের রাজ্যে। ঠাঁই দাও অতিথিদের। জায়গাজমি কসাড় জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, শিয়াল বনবিড়াল হায়েনা থাকে। জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে ঘর বেঁধে সেইখানে একটু মাথা গুঁজে থাকব।

কিন্তু কাকুতিমিনতি যতই কর, কেউ কানে নেবে না। এক মানুষের দুঃখে অন্য মানুষ নির্বিকার, এটাই সাধারণ নিয়ম। ঈশ্বরের ধরিত্রী পড়েই আছে, খুঁজে পেতে তার উপরে বসত গড়ে নাও। স্টেশনে শুয়ে পা নাচিয়ে কিছু হবে না। পুরুষসিংহ হবে, লক্ষ্মী তবেই লুটিয়ে এসে পড়বেন।

বেরিয়ে পড়ে আশিস জায়গাজমি খুঁজতে। শুধুমাত্র নিজের বাড়ির কয়েকটি নয়—যত লোক তার সঙ্গে এসেছে সকলের স্থিতি করে দেবার দায়িত্বভার যেন তারই উপরে। বেরোবার সময় জোয়ানযুবা যত আছে সকলকে ডেকে নেয়: চলে আসুন আমার সঙ্গে। রাতের ঘুম বন্ধ করুন যতদিন না ঘরবসত হচ্ছে।

দিনমানে এর মুখে তার মুখে জায়গার খবরাখবর আসে। রাত্রিবেলা দেখতে বেরোয়। দশজনের বিশজনের এক একটি দল হয়ে। মিউনিসিপ্যালিটি-এলাকার মধ্যে সুবিধা হবে না, তার আশেপাশে। বড়লোকে অনেক জায়গা নিয়ে রেখেছে। নালা-ডোবা-জঙ্গলে ভরতি—সাপ-শিয়ালের আস্তানা। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে স্ফূর্তি

বেড়েছে খুব—দাঁও মতো বিক্রি করে মোটা মুনাফা পিটবে এবার। দাঁড়াও না চাঁদ, স্ফূর্তি বের করছি তোমাদের।

মরীয়া হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কলোনি গড়বে, জায়গা চাই। ঘুরতে ঘুরতে নাজেহাল। পছন্দসই জায়গা কোথাও মেলে না। আগে যারা এসেছে, ভাল জায়গাজমি তারাই সব দখল করে নিয়েছে। সমস্ত রাত অবিরাম ঘুরে ঘুরে ভোরবেলা রাস্তায় আলো ফোটবার আগে স্টেশনে নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসে। এসে মড়ার মতো ঘুম। ঠিক দুপুরে মীটিং বসে : কী করা যায়! বেশি বাছাবাছি করতে গেলে হবে না, কোন একখানে উঠে পড়। কেষ্টপুরের খাল পার হয়ে একটা চৌরস জায়গা, এদিক-সেদিক কতকগুলো তালগাছ ও কয়েকটা ডোবা, লাগোয়া একটা ধানক্ষেত আছে। জায়গাটা নিতান্ত মন্দ নয়। ধানক্ষেতে পুকুর কেটে মাটি তুলে উঁচু করে নিতে হবে বর্ষার আগে। শহরের এত কাছে এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায় আর পাচ্ছি? খোঁজাখুঁজি হল তো বিস্তর।

দলবল নিয়ে আশিস অতএব আনুষঙ্গিক কাজকর্মে লেগে পড়ল। দিনমানেও এখন তারা স্টেশনে থাকে না। জানাশোনা আলাদা এক জায়গায় দিবারাত্রি কাজ চলছে। নতুন কলোনি গড়ার কাজ। বাঁশ-খড় কিনে এনে একসঙ্গে অমন বিশখানা ঘরের চাল বানাচ্ছে, চাল ছেয়েও ফেলছে ভুঁয়ের উপর রেখে। বেড়া বাঁধছে চেরা-বাঁশের। সাইজ মতো খুঁটি কেটে কেটে স্তূপাকার করছে। এই সমস্ত তৈরি হয়ে রইল। তারপর শুভদিন দেখে —দিনমানে নয়, রাত্রিবেলা মরদেরা চাল-খুঁটি-বেড়া ঘাড়ে করে এনে—ফেলবে সেই পছন্দ-করা জায়গায়। কার ঘর কোনখানে, নক্সা বানিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে আগে থেকে। তখন আর তিলার্ধ দেরি নয়, গর্ত খুঁড়ে টপাটপ খুঁটি পুঁতে ফেল। চাল উঠে যাক খুঁটির উপরে, বেড়া তুলে দেওয়া হোক চতুর্দিকে। দেখতে দেখতে

পরিপাটি ঘর। খবর পেয়ে পরের দিন জমির মালিক হন্তদন্ত আসবে, এসে কপাল চাপড়াবে। পাড়া বসে গেছে রাতারাতি। ঘর নিকানো হচ্ছে, বাচ্চা ছেলেপুলে কাঁদছে, উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছে কোন বাড়ি, বাসন মাজছে কোন বউ ঘাটে গিয়ে, খুঁটি ঠেসান দিয়ে গৃহকর্তা তামাক খাচ্ছে কোথাও। ঠিক যেমনটি হতে হয়। মালিক মশায় এসে হয়তো কোন প্রশ্ন করলেন। শান্তি-ভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গৃহকর্তা খিঁচিয়ে ওঠে তাঁর উপর: আরে মশায় আছি তো কতকাল ধরে এখানে, আপনি কি আজ নতুন দেখছেন? ফ্যাচ-ফ্যাচ করবেন না, আর কোন কাজ থাকে তো তাই করুনগে। মুখ ভোঁতা করে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া মালিকের তখন উপায় থাকে না।

সেই দিন আসছে, দেরি নেই। আয়োজন প্রায় সারা। দিন সাতেক কেটেছে ইতিমধ্যে। এমনি অবস্থায় এক সকালবেলা বিনয় হঠাৎ স্টেশনে এসে উপস্থিত। চমকে গেল আজব ব্যাপার দেখে—পল্লীগ্রামের নতুন বউয়ের মতো বাঁশির মাথায় কাপড়। দশ ইঞ্চির উপর ঘোমটা। বিনয়কে দেখতে পেয়ে চক্ষের পলকে বাঁশি ঘোমটা নামিয়ে দিল। কলকণ্ঠে বলে, কী আশ্চর্য, বিনয়-দা এসে পড়েছে। আমরা যে এখানে, টের পেলে কেমন করে বিনয়-দা?

কী ব্যাকুল আগ্রহ কণ্ঠের স্বরে। বিনয়ের অন্তত তাই মনে হল। বিনয় আজ যেন অকূল-সাগরে আলোকস্তম্ভ। সাত সাতটা দিন কেটে গেছে স্টেশনের হাটের মধ্যে। নতুন কলোনি হবে, সেইখানে উঠতে হবে এবার গিয়ে। সে হয়তো আরও খারাপ জায়গা, পাশাপাশি যাদের সঙ্গে থাকবে, তারা হয়তো আরও ইতর। বাঁশির মুখের তেজ ঠিকই আছে, মনে মনে ঘাবড়ে যাচ্ছে। এমনি সময় বিনয়।

সদাশিব অশ্বিনী আর বিরজার পায়ের ধুলো নিল বিনয়। অশ্বিনী

বলেন, টের পেলে কেমন করে আমরা কলকাতায় এসেছি, এসে এই স্টেশনে পড়ে আছি ?

বাবা চিঠি লিখেছেন। সোনাটিকারি ছেড়ে হঠাৎ আপনারা চলে এলেন—খোঁজ নিয়ে যতদূর সাধ্য দেখাশোনা করতে লিখেছেন আমায়। উঠেছেন কোথা, জানা নেই। স্টেশনে এলাম—আমাদের অঞ্চলের কেউ না কেউ নিশ্চয় আছেন, তাঁদের কাছে খবর পাওয়া যাবে। বুদ্ধি করে এসে ভালই হল, আপনাদের পেয়ে গেলাম।

অশ্বিনী লজ্জা পাচ্ছেন। মামুলি দুটো-একটা কথার বেশি বলতে পারেন না। জিভ আটকে যায়। সোনাটিকারি ছেড়ে হরিবিলাসকে মাইল পাঁচেক দূরে জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। সেই জায়গায় থেকেও তিনি পুরানো মনিবের খোঁজ রাখেন। এত কাণ্ডের পরেও ছেলেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখাশোনা করবার জন্য চিঠি লিখেছেন।

বিরজা কিন্তু ভাল মনে নিতে পারছেন না। ফিসফিস করে বলেন, ছোঁড়া এই অবধি ধাওয়া করে এসেছে। কেন এসেছে বল দিকি ?

অশ্বিনী বলেন, কেন ?

বাপের চাকরি খেয়েছ, তাই ধর্ম দেখতে এসেছে। সোনাটিকারির মেজরাজা ভিখারির বেহদ্দ হয়ে স্টেশনে বসেছে, দুচোখ ভরে মনের সাধে দেখে নিচ্ছে।

সেই কথা বাঁশির কানে গিয়ে থাকবে। বিনয়কে বলে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ কি বিনয়-দা ?

বিনয় থতমত খেয়ে বলে, কেমন আছ বাঁশি ?

দিব্যি আছি। আগের চেয়ে আরও অনেক ভাল। রাজবাড়ির ছাত উঁচু বলতে তোমরা, কিন্তু উপরমুখো তাকিয়ে দেখ—সে কি এই শিয়ালদা স্টেশনের মতো ? রাজবাড়ির বড় বড় ঘর, তা হলেও কি স্টেশনের মতো বড় ? মানুষ এক সময়ে কিলবিল করত রাজবাড়ি—

চতুর্দিকে আঙুল ঘুরিয়ে বাঁশি বলে, তবু কি এত মানুষ? দেখ কি বিনয়-দা, রাজবাড়ির ভাগ্যবতী রাজকন্যা—ঘরবাড়ি বিসর্জন দিয়ে আরও বড় জায়গায় এসে উঠেছি। এখান থেকে এবারে না জানি কোথায়—এত উঁচু ঘর যার ছাত হল আকাশ, এমন বড় জায়গা যাতে বেড়া দিয়ে গণ্ডি ঘেরা নেই—

সেই বৃহৎ প্রত্যাশার আনন্দে বাঁশি খিলখিল করে হেসে উঠল, কথা আর শেষ হল না।

হাসি দেখে বিনয়ের চোখে জল আসবার মতো। কিছু সামলে নিয়ে বাঁশি আবার বলছে, বনেদি বাড়ির মেয়েরা অন্দরে থেকে ইতরজনকে মুখ দেখায় না। স্টেশন জায়গায় অন্দর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তবু কিন্তু আমি মুখ ঢেকে বেড়াচ্ছি বিনয়-দা। তুমি ইতরজন নও—বড়মানুষ এখন, শহুরে মানুষ। তোমায় দেখেই মুখ খুলে ফেলেছি।

বিনয় বলে, সত্যি, তাজ্জব দেখলাম বাঁশি, তোমার মাথায় ঘোমটা।

ঐ যে বললাম—বনেদিয়ানা। তোমার কাছে বলতে কি—বনেদিয়ানার উপরে আরো কিছু আছে—পরোপকার। লোকের বিপদ দেখে আমার কষ্ট হয়। আমার পানে না চেয়ে থাকতে পারে না—হাঁটে আর আড়চোখে ফিরে ফিরে তাকায়। আর হোঁচট খেয়ে পড়ে। গাড়িই ফেল করে কত জন, বউ সঙ্গে থাকলে খিঁচুনি খায়।

আবার এক চোট হাসি। সহসা গম্ভীর হয়ে বাঁশি বলে, আমার মাথায় ঘোমটা দেখেই তাজ্জব হলে বিনয়-দা? কত তাজ্জব আজ চোখের সামনে। রাজবাড়ির মানুষ শিয়ালদা স্টেশনে সতরঞ্চি বিছিয়ে আস্তানা নিয়েছে। আমরা একা নই—ঐ যে আরও সব কত—যাদের আমরা চিনিনে জানিনে। উঁচুতলার মানুষরা ভিখারির সঙ্গে লাইন দিয়ে আছে। এদেশে নাকি বিপ্লব হয়নি, চুপিসাড়ে

শান্তির মধ্যে স্বাধীনতা এসে গেল। কিন্তু রক্তপাতেই যদি বিপ্লবের বিচার, সেদিক দিয়ে তো কম যাইনে আমরা। দেশের পূব আর পশ্চিমে যত রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে, কোনদিন তার মাপ হবে কিনা জানিনে।

সদাশিব নিঃশব্দে শুনছেন, একটি কথাও বলেননি এতক্ষণের মধ্যে। হাতের ইঙ্গিতে বিনয়কে ডেকে একটু দূরে নিয়ে যান। বললেন, বিনয়, উপায় করতে পারিস তো নিয়ে যা এখান থেকে কোথাও। নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা। আজকে পারিস তো কাল অবধি দেরি করিসনে। সেকেলে মানুষ বিরজা-দিদি ঘোমটা দিয়ে থাকেন, সেটা কিছু নতুন নয়। আজ ক'দিন বাঁশি ঘোমটা দিচ্ছে, না দিয়ে উপায় নেই বলে। পুরুষেরও ঘোমটা দেওয়ার রেওয়াজ থাকলে ভাল হত, ঘোমটা দিয়ে মেজরাজা রক্ষা পেয়ে যেত। সর্বদা ভয়, পাছে চেনা-মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পরশুদিন তাই হতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘোরাল, ভাল চিনতে পারেনি তাই। বলতে বলতে যাচ্ছে, সোনাটিকারির মেজরাজা নয়? আর একজন বলছে, মেজরাজা যেদিন এখানে আসবে, কলি উলটে যাবে সেদিন।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, কলি সত্যিই উলটেছে বাবা। বাঁশি তোমায় সেই কথাই বলছিল, এই ক'দিনে এখানে তাই চোখের উপর দেখছি। আগেকার সঙ্গে কিছু আর মিলছে না।

থেমে গেলেন সদাশিব। তারপর গলা আরও নামিয়ে অকারণে এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, মেজরাজা তোকে কিছু বলবে না। বলার মুখ নেই তার। কিন্তু এই হাটের মধ্যে ঘোমটা দিয়ে আর মুখ আড়াল করে কতদিন কাটানো যায়? এদের এই দুর্দিনে তোর কিছু কর্তব্য আছে কিনা, দেখ ভেবে বিনয়।

বিনয় সহসা জবাব দিতে পারে না। রাত্রিবেলা খেটেখুটে এসে আশিস ঘুমচ্ছিল বিভোর হয়ে। চোখ মুছতে মুছতে সে উঠে পড়ে

এইবার। বিনয় আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসল। অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, স্টেশনে এমনভাবে থাকা চলবে না আশিস-দা।

আশিস অসহিষ্ণুভাবে বলে, থাকছে কে! তিনটে কি চারটে দিন বড় জোর। সোম-মঙ্গলবার নাগাত এসে দেখবে, নেই আমরা। আমাদের তল্লাটের এই যত জনকে দেখ, সবসুদ্ধ চলে যাব।

বিনয় বলে, সোম-মঙ্গলবারে আমি আসতে যাব না। এই একবার যা এসে পড়েছি, দায়ে না পড়লে কোনদিনই এদিকে আসব না হতভাগা মানুষদের দুর্গতি দেখতে। তিন-চার দিন পরে যেখানে যাবার চলে যেও। কিন্তু এ জায়গায় তিলার্ধকাল আর নয়। আপাতত আমার সঙ্গে যাবে। যেতেই হবে।

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলে, না নিয়ে আমি নড়ব না জেঠাবাবু। আপনার আর পিসিমার পা জড়িয়ে ধরব।

সদাশিব খুশি হয়ে বলেন, তোর বাসায় নিয়ে যাবি? শুনেছি বড় জায়গা। এতজনকে নিয়ে অসুবিধা হবে না তো রে?

বিনয় বলে, থাকবার দিক দিয়ে যদি বলেন, মানুষ বেশি হলে অসুবিধা নেই। পাকাপাকি জায়গা আশিস-দা ঠিক করে ফেলেছেন—মাঝের তিন-চারটে দিন শুধু। এই ক'দিনের ব্যবস্থা যেভাবে হোক করতে হবে। তা ছাড়া উপায় কোথায়?

ঘোড়ার-গাড়ি ঠিক করল। যে ক'টা জিনিস বর্ডার পার হয়ে পৌঁছেছে, গাড়ির ছাতের উপর তুলে দিল। বিনয় বসল কোচোয়ানের পাশে কোচবাক্সের উপর। ভিতরে চারজন। আশিস এখন যাবে না—কাজ অনেক। অঞ্চলের মানুষ নিয়ে ভাবনা তার, শুধু নিজের বাড়ির এই কটিকে দেখলে হবে না। বিনয় ঠিকানা রেখে গেল, সন্ধ্যায় গিয়ে একবার দেখে আসবে। সোনাটিকারির সবচেয়ে বনেদি বাড়ির যাবতীয় মানুষ ও জিনিসপত্র একখানা থার্ডক্লাস গাড়ি বোঝাই হয়ে চলল।

॥ দশ ॥

সিংহওয়ালা বিশাল ফটক পার হয়ে ঘোড়ার-গাড়ি ভিতরে ঢুকল। চোখ বড় বড় হয়ে যায় সকলের। এমনি জায়গায় থাকে! সত্যি, আঙুল ফুলে কলাগাছ তো নয়—শালগাছ। ঝিলের পুল পার হয়ে বড়পুকুর-ঘাটের পাশে পাকাবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ায়। জিনিসপত্র নামিয়ে কোচোয়ানের সঙ্গে ধরাধরি করে বিনয় বারান্দার উপর নামিয়ে রাখছে।

বাঁশি বলে, এত বড় বাসা তোমার বিনয়-দা?

সে কথার জবাব না দিয়ে বিনয় বলে, চাবি এনে ঘর খুলে দিচ্ছি। বারান্দায় উঠে বস ততক্ষণ।

চাবি আনতে যাবে—এসব ঘরে তুমি থাক না বুঝি বিনয়-দা?

বিনয় বলে, একতলার খুপরিঘরে চিরকাল মানুষ, এখানে ঘুম হবে কেন? সব মনিবই বোঝেন সেটা ভাল রকম।

ঠেসটুকু তাদের উপরেও। রাজবাড়িতে কর্মচারীদের জন্য পায়রার খোপের ব্যবস্থাই ছিল। কথাটাও বিশেষ করে যেন বাঁশিকে বলা—একতলার খুপরিঘরের খোঁটা একদিন সে-ই দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেসব গায়ে মাখবার দিন নয়। চাবি আনতে বিনয় চলেছে তো বাঁশিও তার পিছন ধরে চলল।

আমরা কেন তোমার ঐখানে গিয়ে থাকি না! সকলে একসঙ্গে। আলাদা করে দেবার মানেটা কি? চল, দেখে আসি, কেমন সে জায়গাটা তোমার।

বিনয় বলে, ভাল জায়গা। সবুজ লতাকুঞ্জ, রকমারি ফুল ফুটে আছে—

একটুখানি হেসে বলে, আমার বাসাবাড়ি দেখে পদ্য লেখা যায় খুব। তবে থাকতে কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বাইরে পড়তে না পড়তে টিনের চালের ফুটো দিয়ে টপটপ করে ঘরে পড়বে। পড়তেই থাকবে,

বৃষ্টি ধরে গেলেও পড়বে—থামাথামি নেই। বোশেখমাসে তোমাদের তুলসীমঞ্চে জলের ঝারা দিত, ঠিক সেই রকম।

বাঁশি বলে, বর্ষাকাল নয়, বৃষ্টির ভয় কিসের অত? বৃষ্টি হলেই বা কি, ভিজতে তো মজাই।

বিনয়ের টিনের ঘরের বাসায় বাঁশি ঘুরে ঘুরে দেখল অনেকক্ষণ। কেমন দেখছ?

বাঁশি বলে, সামনেটা এমন সুন্দর লতায় পাতায় ঘেরা। যেন চিনির কোটিং-দেওয়া কুইনাইন-পিল।

থাকবে এখানে?

বাঁশি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভয় করি নাকি? ভয় জয় করেছি। শিয়ালদা স্টেশনে থেকে এসেছি—তার উপর কি চাও! দেখ, গরিবানা নিয়ে বড্ড অহঙ্কার তোমার বিনয়-দা। তবু যদি স্টেশনের উপর ঘরবসত করতে একটা দিন! সাত সাতটা দিন আমরা তাই করে এলাম। গরিবানায় আর তুমি টক্কর দিয়ে পারবে না।

চাবি নিয়ে এসে বিনয় পাকাবাড়ির দোর খুলে দিল।

বাঁশি তখন সকলের কাছে বিনয়ের বাসার বর্ণনা দিচ্ছে। সমস্ত শুনে সদাশিব চিন্তিত ভাবে বললেন, মনিবকে না জানিয়ে ঘর তো খুলে দিচ্ছিস বিনয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, তোর কোন ক্ষতি হবে কি না। মনিব কিছু বলবে না তোকে? তিন-চারটে দিনের ব্যাপার মোটে—তোর ওখানেই যা-হোক করে মাথা গুঁজে থাকা যেত।

বাঁশি ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয়ঃ শিয়ালদা স্টেশনে বসত করে এসেছি। আগুনের মধ্যে থাকলেও আর পুড়ব না, সাগরের নিচে রাখলেও ডুবব না। আমাদের সোনাটিকারির রাজত্বের কথা তুমি কিছুতে যে ভুলতে পারছ না বিনয়-দা।

বিনয় শোনে না। পাকাঘরের ভিতর জিনিসপত্র নিয়ে ঢোকাল। বলে, ভাবনা করবেন না মাস্টারমশায়। যখন প্রেসটা ছিল, রঞ্জিত

রায় মাসে একবার দু-বার আসতেন। এখন দু-মাসেও একবার আসেন না। পাটনা ঝরিয়া আর কলকাতা করছেন, স্থির হয়ে থাকেন না মোটে। টেরই পাবেন না যে আপনারা এসে ক'দিন থেকে গেছেন।

সদাশিব তর্ক করেন : আসেন না ঠিক কথা। কিন্তু গেরোর কথা বলা যায় না—দৈবাৎ ধর, আজকেই এসে পড়লেন! এসে দেখলেন, অনধিকার-প্রবেশ করে আছি—

দেখলে কী হবে? বুঝিয়ে দেব, বিপদে পড়ে এসেছেন, পাকা হয়ে থাকতে আসেননি। ঘর যেমন ছিল তেমনিই তো খালি পড়ে থাকবে চারটে-পাঁচটা দিনের পর।

ভয়-দেখানো কথায় বিনয় কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করে না। বলছে, আপনি স্নেহ করেন বলে অতটা ভয় পাচ্ছেন মাস্টারমশায়। রঞ্জিত রায় সুনজরে দেখেন আমায়। আগে আরও বেশি দেখতেন। কিন্তু আমি মস্তবড় অন্যায় করেছি। যে অন্যায় কাজের জন্য আমার বাবার অত দিনের পুরানো চাকরি গেল, আমিও তাই করেছি বাধ্য হয়ে। মনিবকে গিয়ে সমস্ত খুলে বললাম। তবু বহাল রেখেছেন তিনি আমায়। আগের মাইনেই বজায় রেখেছেন। মানুষটি বড় উদার—ক'জনে এমন করে বলুন! সঙ্কোচ করবেন না মাস্টারমশায়। ক'দিনের অতিথি হয়ে আমার বাসার ঘরে ঐ কষ্ট করে থাকবেন—মন আমার কিছুতে সায় দিচ্ছে না।

অগত্যা সদাশিব রাজি হলেন। হোক তবে তাই। বাঁশিকে সাবধান করে দিচ্ছেন, এবং বাঁশির নাম করে সকলকেই : এই চারটে দিন সামনের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ সব ঘরের মধ্যে কাটাবি। নেচেকুঁদে বেড়াবিনে। কেউ বুঝতে না পারে ভিতরে লোক এসে রয়েছে। সেটা বিনয়ের ক্ষতির কারণ হবে।

আশিস ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিল বিনয়ের কাছ থেকে, সন্ধ্যার পর

দেখতে এল। একলা নয়—সঙ্গে জন চারেক। নতুন যে কলোনি গড়া হচ্ছে—এরা সকলে মাতব্বর, জায়গা পছন্দ থেকে শুরু করে যাবতীয় বন্দোবস্ত এরাই সব করছে।

বাঃ, বেড়ে বাগান তো। গোটা রাজ্য জুড়ে বাগান বানিয়ে রেখেছে। খরচা করে ডাঙার উপরে খাল কেটে সেই খালের উপরে আবার পুল। শখ বটে বাবা!

সাবেকি কর্তাদের শখের পরিচয় বাগানবাড়ির সর্বত্র। ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে, আর হাসে খিক-খিক করে। একটি ছেলে নীরেন। সে বলে, পয়সা থাকলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে। পয়সার অনটনে আসল বাপের মাথা গুঁজবার একটুকু ঠাঁই জোটানো যায় না।

আশিস বলে, আমার বাবার কিন্তু দিব্যি ঠাঁই মিলেছে। কি বল হে? এমন সুন্দর ঘরবাড়ি, কে ভাবতে পেরেছে! আমরাও বড়মানুষ ছিলাম, রাজবাড়ির বিস্তর নামডাক। তা বলে এবাড়ির কাছে লাগে না। পাড়াগাঁয়ে ভাবাই যায় না এমনটা।

এরই মধ্যে বাঁশি একটু চা করেছে আশিস ও তার বন্ধু ক'টির জন্য। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আশিস হাসিমুখে বিরজাকে বলে, একবার যখন উঠে পড়েছ, এইখানে চেপে বসে থাক পিসিমা। নড়াচড়ার কী দরকার। আমরা যে জায়গা দেখছি, সে এক তেপান্তরের মাঠ। গোটা দুই-তিন ডোবা এখানে-ওখানে, একহাত দেড়হাত জল। এমন তকতকে পুকুর পাবে না—চানের পুকুর নতুন করে কেটে নিতে হবে। খাবার জল আনতে হবে মাইল-খানেক দূরে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে।

সদাশিব শুনতে পেয়ে জিভ কেটে বলেন, খবরদার, খবরদার! অমন কথা ভুলেও জিভের ডগায় আনবিনে আশিস। হরিবিলাস খাজাঞ্চিকে নিয়ে তোরা কি করলি, তার ছেলে বিনয় কী রকম শোধটা দিল, দেখ বুঝে। যাঁদের এই ঘরবাড়ি, তাঁদের সম্পূর্ণ

গোপন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছে—সে না বললেও বুঝতে পারি। স্টেশনে আমাদের দশা দেখে থাকতে পারেনি—নিয়ে এসে তুলল এখানে। ছোঁড়াটা পড়াশুনায় অঘা ছিল, কিন্তু বড্ড সহৃদয়। আমাদের জন্যে তার কোন ক্ষতি হলে সেটা বিষম অন্যায় হবে।

অশ্বিনী বলেন, শিব-দাদা, নাম তোমার সদাশিব, মানুষটাও ঠিক তাই। মনের মধ্যে এতটুকু ঘোরপ্যাঁচ নেই—বুড়ো হয়েছ তবু একেবারে শিশু। শুচিবেয়ে মানুষ দিদি, দিনের মধ্যে অমন দশবার চান করেন। আশিস তাই নিয়ে তামাসা করল, তুমি একেবারে বেদবাক্য বলে ধরে নিলে।

তারপরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কাজের কত আর বাকি ?

সেই নীরেন ছেলেটি বলে, পাঁচ-ছ'খানা চাল বাঁধতে বাকি, আর সব হয়ে গেছে। রবিবারে গৃহপ্রবেশের ভাল দিন—ওর মধ্যে শেষ করে ফেলব। প্রথম মহড়ায় কুড়ি ঘর গৃহস্থ—ক্রমে আরও সব যাবে।

বিরজা বলেন, ভাবতে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে বাবা। চোরের মতন রাত-বিরেতে পরের জায়গায় গিয়ে ওঠা—কোন অঘটন ঘটে না জানি !

আশিস ভরসা দিয়ে বলে, এই কাজ শুধু আমরাই করছিনে পিসিমা। যেখানে যত পোড়ো-জায়গা ছিল, দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল। কলোনিতে কলোনিতে ছয়লাপ। ঘরদোর বেঁধে নির্ঝঞ্ঝাটে সবাই সংসার করছে, আমাদেরই বা অঘটন ঘটতে যাবে কেন ?

নীরেন এতক্ষণ ফুঁসছিল বুঝি মনে মনে। সদাশিবকে লক্ষ্য করে বলে, আপনি মাস্টারমশায় ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুললেন। লাখ লাখ মানুষের উপর কত বড় অন্যায়টা হল, তার কোন বিচারটা হয়েছে

বলুন। নিরীহ তুচ্ছ অতি-সাধারণ গৃহস্থমানুষে, মার্জনাভির ঘোরপ্যাঁচ কিছু বোঝে না—রাতারাতি পথের ভিখারি হতে হল তাদের। না রইল টাকাপয়সা, না রইল মানইজ্জত। প্রাণটুকু হাতে করে যে অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিল, সেখানকার মানুষও ভাল চোখে দেখে না। সকলের আপদ-বালাই। বলে, মহাভারতের ঘটোৎকচ—নিজেরা তো মরবেই; মরবার মুখে আমাদেরও চাপা দিয়ে মারবে, সেই মতলবে এসেছে।

বলতে বলতে যেন আগুন ধরে যায় তার কণ্ঠে। বলে, মাস্টার-মশায়, আদর্শবাদী মহাপ্রাণ মানুষ আপনি। বলুন দেখি, কোন দোষে দোষী ঐ মানুষগুলো, রেলস্টেশনে মাঠে জঙ্গলে পথের ধারে পড়ে পড়ে যারা মরছে? বিচার চাচ্ছি আমরা। আকাশের আড়ালের ভগবান ফুরসত মতো কোন-একদিন বিচার করে দেবেন, অতদিন সবুর সইবে না। মাথার উপরের মুরুব্বী মানুষেরা আপন আপন মুনাফা কুড়িয়ে তুলতে ব্যস্ত। বিচারের ভার তাই নিজেরাই সাধ্যমত নিয়ে নিচ্ছি।

নীরেনের উত্তেজনায় আশিস হেসে ফেলে। বলে, যেমন ভাবে বলছে, অত ভয়ানক কিছু নয়। বড়লোকে জমি নিয়ে জঙ্গল করে রেখেছে কোন-একদিন দাঁও মারবে এই আশায়। সেইখানে গিয়ে আমরা টপাটপ ঘর তুলে নিচ্ছি। দাম যে একেবারে দেব না, এমন কথা বলিনে। ন্যায্য দাম ধীরেসুস্থে দেব—হাতে যখন টাকাকড়ি আসবে। বলুন, অন্যায়? ভগবান কি সত্যি সত্যি পৃথিবীর জমাজমি বাটোয়ারা করে দিয়েছেন ভাগ্যবান কয়েকটির মধ্যে? তাঁরা ভোগ করবেন অথবা ফেলে ছড়িয়ে রাখবেন—বাকি সকলের খোলা আকাশের নিচে তারা দেখতে দেখতে মরা নিয়তি?

এত সমস্ত ভারী ভারী কথার মধ্যে বিরজা বলে উঠলেন, সেই কথা রইল তবে! রবিবার রাত্রে তোরা আসছিস, আমরা গোছগাছ করে থাকব। খুব বেশি রাত্তির হবে নাকি?

আশিস বলে, সাড়ে-দশটার পর। নীরেন পাঁজি দেখেছে, ভাল সময় পড়বে তখন।
নীরেন হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলে, পাঁজি দেখে তিথির হিসেব করেছি। চাঁদ ডুবে অন্ধকার হবে তখন। চোরেদের পক্ষে ভাল সময়।

॥ এগারো ॥

রবিবার রাত্রিবেলা বাগানবাড়ি ছেড়ে এঁরা চলে যাবেন। বিনয় সেই সময়টা থাকতে পারছে না। মনিববাড়ি উৎসব। রঞ্জিত রায়ের বড় মেয়ে ইলু সোনার মেডেল পেয়েছে কোন এক প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে। তার উপরে কলিয়ারি সংক্রান্ত একটা মামলায় জিত হয়েছে। রঞ্জিত রায়কে সবাই ধরে পড়ল, দু-দুটো আনন্দের ব্যাপার—একদিন খাওয়াদাওয়া হোক স্যার। মামলার জিত কিছুই না—নিচের কোর্টে জিত হল কি হার হল, তাতে কোন মীমাংসা হবে না। কিন্তু মা-মরা মেয়ে ইলু নিজের গুণে মেডেল অর্জন করল, এ জিনিস দশজনের কাছে বুক ফুলিয়ে বলার মতোই বটে। হোক তাই, সকলে যখন বলছেন। তারিখটা ঐ রবিবারেই ফেলেছেন। এবং এমনি ব্যাপারে বিনয়ের উপর অনেক দায়ঝক্কি এসে পড়ে, বাজার করা থেকে শুরু করে তাকেই সমস্ত দেখতে হয়। রবিবার সকাল থেকে সে ভবানীপুরের বাড়ি পড়ে আছে। কাজকর্ম শেষ হতে অনেক রাত্রি হল, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বৈঠকখানায় একটা ইজিচেয়ারের উপর চোখ বুজে পড়ে রাতটুকু সে কাটিয়ে দিল।
ভোরবেলা বিনয় বেরিয়ে পড়ে। মনিববাড়ি আটক পড়ে বাঁশিদের চলে যাবার সময়টা দেখা হল না। কলোনি যেখানে গড়ছে, তার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। তাহলেও জায়গাটার বর্ণনা শুনে নিয়েছে ভাল করে—লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে

পৌঁছনো যাবে। তাই করবে—কেটে যাক এখন ক'দিন, খানিকটা ওঁরা গোছগাছ করে নিন। আসছে রবিবার গিয়ে দেখাশোনা করে আসবে।

ফটকের বাইরে রঘুমণির পান-বিড়ি-চায়ের দোকান। রঞ্জিত রায়ের স্ত্রী জয়ন্তী দেবী তখন বেঁচে, বাগানের উপর ঝোঁক পড়েছিল তাঁর—সেই আমলে রঘুমণি রাউত মালি হয়ে আসে বাগানবাড়িতে। তিনি মারা যাবার পরে বাগানের শ্রী-ছাঁদ রইল না, একের পর এক ব্যবসার পত্তন হতে লাগল এখানে। মালির কাজ ছেড়ে দিয়ে রঘুমণি ফটকের বাইরে ঐ দোকান করে বসল। স্বাধীন ব্যবসা তারও। লোকজন এদিকে কম, দোকান ভাল চলে না। কিন্তু বুড়ো বয়সে রঘুমণি নতুন কোন কাজ ধরবে! বিনয়ের সঙ্গে খাওয়াটা একরকম মুফতে চলে যাচ্ছে—আছে পড়ে তাই দোকানটা নিয়ে। তবে ভরসা দেখা দিয়েছে—ওপারের ডেভিড বিস্কুট-ফ্যাক্টরি। কারখানা চালু হয়ে গেলে অঞ্চল জমজমাট হবে। জমে যাবে তখন রঘুমণির দোকান।

ফটকে ঢোকবার সময় একটুখানি ঘুরে গিয়ে বিনয় রঘুমণিকে জিজ্ঞাসা করে, চলে গেছেন ওঁরা সব? ঘরের চাবি তোমার কাছে দিয়ে যেতে বলেছিলাম।

বিড়ালের মতন রঘুমণি ফ্যাচ করে ওঠে: হুঁ, যাচ্ছে চলে! যাবার জন্যে এসেছে কিনা! মেলা জমিয়ে বসেছে দেখুনগে যান। শয়তানগুলোকে ঢুকতে দিয়েছেন, উল্টে আপনাকেই তাড়িয়ে তুলবে। বড়বাবু এসে দেখলে ধুন্দুমার বাধবে।

বিনয় আর দাঁড়ায় না। হনহন করে ভিতরে চলল। কী ব্যাপার, রঘুমণির কথায় কিছু বোঝা যায় না। কোন কারণে বাঁশিদের যাওয়া হয়নি। কথাটা বাবুদের কানে উঠলে বিনয়ের ক্ষতি হবে, রঘুমণি সেজন্য ক্ষেপে রয়েছে এখন।

ঝিলের পুলের উপর দাঁড়িয়ে বিনয় নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস

করতে পারে না। পাকাবাড়ির এদিকে-সেদিকে চালাঘর। নতুন ছাউনি, নতুন ডোয়াপোতা, নতুন বেড়া। সকালবেলা কাল বেরিয়ে পড়েছিল—তখন ঘাসবন লতাপাতা ঝোপজঙ্গল। ইতস্তত কয়েকটা ফুলগাছ। আজকে সকালবেলা দেখতে পাচ্ছে দস্তুরমতো এক পাড়া। ঝিলের পাশে জলের ধারে বসে বাসন-মাজছেন গিন্নিবান্নি গোছের কয়েকজন। কাপড় কাচছেন। বাচ্চা ছেলেপুলের ট্যাঁ-ভ্যাঁ আওয়াজও পাওয়া যায়। এঘর থেকে ওঘর থেকে কুণ্ডলী হয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার মানে উনুন ধরানো হচ্ছে, রান্নাবান্না চাপিয়ে ছেলেপুলে খাওয়ানো হবে। সকালবেলা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ি যেমন হয়।

বড়-পুকুরের সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালের উপর কামিনীফুলগাছের তলায় সদাশিবকে দেখা গেল। হাতমুখ ধুয়ে বিষণ্ণভাবে একলাটি বসে আছেন। হাত নেড়ে বিনয়কে কাছে ডাকলেন: শুনে যা বিনয়। ভাল করতে গেলি, ডেকে এনে তুললি স্টেশন থেকে, তার কী রকম শোধবোধ দিয়ে দিলাম আমরা, দেখ।

বলতে লাগলেন, রাত সাড়ে-দশটার পর এসে আমাদের নতুন কলোনিতে নিয়ে যাবে। বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে তৈরি হয়ে আছি, ঘড়ি দেখছি। অন্ধকারের মধ্যে দেখি পিলপিল করে দৈত্যদানোরা আসছে। সে যদি চোখে দেখতিস বিনয়! চাল-বেড়া-খুঁটি বয়ে এনে নামাল। কুড়ুল-খন্তা-কাটারি হাতে হাতে। এই ক'দিন রাতে রাতে লুকিয়ে এসে জায়গা-জমি নিজেদের মধ্যে বখরা করে নিয়েছে। এসে তিলার্ধ দেরি নয়—গর্ত খুঁড়ে খুঁটি পুতল, চালগুলো তুলে দিল খুঁটির মাথায়। খুটির গায়ে বেড়া বসিয়ে চতুর্দিক ঘিরে ফেলল। দিব্যি এক এক চালাঘর। এমনি চালাঘর পনের বিশটা হয়ে গেল ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে। ময়দানবের কাণ্ডকারখানা মহাভারতে আছে, সেই ব্যাপার। ঘর বাঁধা হয়ে গেল তো তক্ষুনি লোক ছুটেছে মেয়েছেলে নিয়ে আসতে।

মেয়েলোক নইলে পুরোপুরি গৃহস্থবাড়ি হয় না, শুধু পুরুষমানুষ সহজে হটিয়ে দেওয়া যায়। যাদের বয়স বেশি আর সাহস-হিম্মত আছে, আপাতত তেমনি কিছু মেয়েলোক এসেছে। ছেলেপুলেও দু-চারটা—যাদের ফেলে আসতে পারে না। গতিকটা ভাল করে বুঝে নিয়ে আজ রাত্রে নাকি মেয়ে-পুরুষের দঙ্গল এসে পড়বে। যত চালাঘর হয়েছে, পাশে পাশে রান্নাঘর উঠবে। শুনতে পাচ্ছি তো এই সব।

অশ্বিনীরা পাকাবাড়িটায় উঠেছিলেন, লোকজন এসে পড়ার পর এখনো সেইখানে। অন্য কেউ এ বাড়িতে ঢুকল না। গাঁয়ে যেমন ছিল রাজবাড়ি, এখানে নতুন কলোনিতেও তেমনি প্রধান হলেন অশ্বিনী। অশ্বিনীর বয়স আর আশিসের কাজকর্মের বিবেচনায়। বাঁশির জন্তও বটে। অমন রূপসী মেয়ে নিয়ে পাকাঘরেই থাকা উচিত, অনেকখানি তাতে নিশ্চিন্ত। আরও ভাল—আশিসের দলবল প্রহরীর মতো ঘিরে রয়েছে। ছেলেরা রাত্রি জেগে পালা করে পাহারা দেবে লাঠি হাতে নিয়ে। এবং প্রকাশ্য ঐ দুটো অস্ত্র ছাড়া গোপন অস্ত্রেরও কিছু কিছু সংগ্রহ আছে। নতুন কলোনি পত্তনের পর এমনি সতর্ক হয়ে থাকার রীতি। মালিকের পক্ষ হঠাৎ দলবল নিয়ে চালাঘর ভেঙেচুরে আগুন দিয়ে উৎখাত করতে না পারে।

এইসব রাত্রিবেলার ব্যবস্থা। দিনমানে সামনের মাথায় আপাতত কোন বিপদ দেখা যাচ্ছে না। চালাঘর থেকে পুরুষমানুষ ক্রমশ একজন দু-জন করে বেরুচ্ছে। সারারাত ভূতের মতো খেটে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিল। দাঁতন ভেঙে নিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বাঁধানো ঘাটের উপর এসে বসছে। গাঁয়ের বারোয়ারি-তলা অথবা লাইব্রেরি-ঘরের মতো এই ঘাটই একদিন কলোনির ওঠা-বসার জায়গা হয়ে উঠবে, বোঝা যাচ্ছে।

আশিসও এসে গেল। বিনয়কে এইখানে দেখে কিছু লজ্জা পেয়ে

থাকবে। সদাশিবকে উদ্দেশ করে নিজে থেকেই বলছে, কি করব মাস্টারমশায়। দশের ব্যাপার, আমার একলার কথায় কী যায় আসে। কেউ শুনল না। বলে, কাছেপিঠে এমন আহা-মরি জায়গা—তেপান্তরের মাঠে কলোনি গড়ে মরতে যাই কেন? নীরেনরা সেদিন ঐ যে সঙ্গে এসেছিল, গিয়ে ওরা গল্প করল। সবসুদ্ধ রে-রে করে উঠল অমনি।

নীরেনের কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। হাসতে হাসতে বলে, পয়সাকড়ি দিয়ে জমি কিনতে পারব না—আমাদের হল বিনি-পয়সার ভোজ। সেই ভোজে পোলাও-কালিয়া পাচ্ছি যখন, বেগুনি-ফুলুরি খেতে গেলাম কেন? চুপিসারে এসে ঘর তুলতে হবে—তা সে বাগানবাড়ি হোক আর কেষ্টপুরের মাঠে হোক। খাটনি একই। তবে আর মাঠে যেতে যাব কেন? কপাল ভাল আমাদের, কেষ্টপুরে পাকাপাকি হবার আগে এখানটায় নজর পৌঁছে গেল।

সদাশিব ব্যাকুল হয়ে বলেন, শুধু নিজেদের দিকটা দেখলে বাবা, এই বিনয়ের কথা ভাববে না একটিবার? বাগানবাড়ির মালিকরা কেউ চোখ তুলে দেখেন না, সমস্ত ভার বিনয়ের উপরে। আমাদের কষ্ট দেখে বিনয় স্টেশন থেকে ডেকে এনে আশ্রয় দিল। সেই সুবাদে তোমরা এলে, ঘুরে ঘুরে জায়গাজমি দেখলে। এখন এই বিনয়ের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, বল দেখি।

নীরেন নির্বিকার কণ্ঠে বলে, খারাপ কেন হবে? দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিন উনি। কাল মনিববাড়ি ছিলেন, তার মধ্যে রাতারাতি এই কাণ্ড হয়ে গেছে। নতুন কিছু নয়, আকছার হচ্ছে এমনধারা। হায়-হায় করে ছুটে গিয়ে পড়ুন মনিবের কাছে। একেবারে কিচ্ছু জানেন না, বলুন গিয়ে।

আশিসও এই সঙ্গে যোগ দিল: কষে [illegible] গালিগালাজ করগে বিনয়। জানাশোনা আছে আমাদের সঙ্গে, বাবা আগে থেকে

এসে উঠেছেন—মনিব এসব কথা জানবে কেমন করে? তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়বে।

এমনি কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে বিনয় ভাবতে ভাবতে বাসার দিকে গেল। সেখানে বাঁশি। বাঁশি কোমরে কেরতা দিয়ে ঝাঁটা হাতে টিনের চালের ঝুল ঝাড়ছে। ঝাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুল টেনে আনছে। সেদিন দেখে গেছে ঝুল-কালিতে ভরতি ঘর, সকালবেলা এসে তাই লেগেছে। দোর খুলে দিয়েছে রঘুমণি নিশ্চয়। রঘুমণির সঙ্গে বাঁশি এই ক'দিনে জানাশুনো করে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। বাঁশি কাজকর্ম করছে, রঘুমণি এই ফাঁকে কলসি নিয়ে বেরিয়ে গেল রান্নার জল আনতে।

বিনয় থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল দেখে। ম্লান হেসে বলে, কে থাকবে এখানে—কার জন্তে তুমি খেটে মরছ বাঁশি? বড়বাবুর কানে পৌঁছতে যেটুকু দেরি। তারপরে একটা বেলারও ঠাঁই হবে না। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পারব না আমি। দেখাশোনার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, আমা হতে এত বড় ক্ষতিটা হল!

বাঁশি বলে, রঞ্জিত রায় টের পাবেন কি করে যে তোমার কোন হাত রয়েছে এর ভিতরে?

ঘাটে এইমাত্র যে সব কথা হল, বাঁশির মুখেও অবিকল তাই। আলোচনা আগেই তবে নিজেদের মধ্যে হয়েছে।

বাঁশি বলতে লাগল, আরও ভাল হয়েছে, কাল রাত্রে ওঁদের বাড়ি ভবানীপুরে ছিলে তুমি। কেউ কিছু বলতে এলে সাফ বেকবুল যাবে। আমরা আগে এসে এখানে উঠেছি, শুধু এক রঘুমণি জানে। সে কাউকে বলতে যাবে না।

বিনয় কাতর হয়ে বলে, ছলচাতুরি আমি পারিনে, সামান্ত একটা মিথ্যেকথা বলতে-বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে। জীবনে একটিবার শুধু মিথ্যাচার করেছি—আমার মায়ের সঙ্গে। কলকাতায় ভাল

চাকরি করছি, মস্তবড় বাসা ভাড়া করে আছি—এই সমস্ত বলেছিলাম। মাকে তৃপ্তি দেবার জন্ম। জানি, মা আমার বাঁচবেন না। মিছেকথা বলে মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম মৃত্যুর আগে। সেই একবার যা হয়ে গেছে, আর অমন পেরে উঠব না।

বাঁশি মুহূর্তকাল স্তব্ধ রইল। সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, সেইজন্য বলি বিনয়-দা, একালে জন্ম নেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। তুমি সত্যযুগের মানুষ। সাদা কথায় যার নাম অপদার্থ।

রঘুমণি এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের কলসি নামিয়ে সে শুনছিল। সে বলে, দোষ তোমার নয় বিনয়বাবু, তুমি আর কী করেছ। কারখানার জন্ম ডেভিড সাহেব আগে এই বাগানটাই নিতে চাচ্ছিল। ভাল দাম দিত। ছ-মাস তার লোক হাঁটাহাঁটি করেছে। ম্যানেজার কতবার বলল, ছোটবাবু বললেন। কিছুতেই দিলেন না বড়বাবু, গোঁ ধরে রইলেন। ছাপাখানাটা ছিল, তা-ও দিলেন তুলে। ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে, খালি জায়গাজমি দেখলেই দখল করবে। এরা না এলে অন্য দল এসে পড়ত। দোষ তো বড়বাবুর। ভাবলেন, চেপে বসে থেকে দাঁও মারব। মূলে হাবাত এখন।

ঘাড় নেড়ে বিনয় প্রতিবাদ করে: না রঘুমণি, দাঁও মারার ব্যাপার নয়। আমি সমস্ত জানি। বড়বাবু বললেন, ডেভিড সাহেব যদি বিস্কুটের ফ্যাক্টরি করতে পারে, আমরা কেন পারব না? বাঙালি কম কিসে? কলিয়ারি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, একসঙ্গে দুটো দিনও স্থির হয়ে কলকাতা থাকতে পারছেন না। মতলব ছিল, কলিয়ারির ঝামেলা কাটিয়ে এসে উঠেপড়ে লাগবেন। ফ্যাক্টরি নিশ্চয় হত।

॥ বার ॥

অনেক ইতস্তত করে অবশেষে বিনয় ভবানীপুরে খবর দিতে চলল। খবর কিছু আগেই পৌঁছে গেছে। জমির দালাল—লোকটা ডেভিড সাহেবের জন্য বিস্তর ছুটোছুটি করছে—খবর কানে শুনেই বাস-ভাড়া খরচা করে হাজির। রঞ্জিত তখন বাড়ি নেই, ইলু আর নীলু দুই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সম্ভবত নিউমার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা হবে তাদের জন্য, তারপর বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়ে আসবেন। বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনো করে তারা, বাড়িতে কার হিল্লেয় থাকবে? ছেলে রন্টু থাকে নেবুতলায় তার দিদিমার কাছে। জয়ন্তী দেবী মারা গিয়ে সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল। ছোটভাই ইন্দ্রজিতকেও যদি বিয়েয় রাজি করানো যেত!

রঞ্জিত রায় নেই, তবে ম্যানেজার পুলিনবিহারী অফিসঘরে আছে। জবরদখলের কথা লোকটা পরমানন্দে রসিয়ে রসিয়ে বলে। ডেভিড সাহেবের ভারি পছন্দ ছিল জায়গাটা, টানাহেঁচড়া করে হয়তো দেড় পর্যন্ত তোলা যেত। তা রায়মশায় মোটে কানে নিলেন না, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতেন না। আপনিও সার দুর-দুর করতেন। এখন? দেড়টা তামার পয়সাও তো দেবে না ওরা। উচ্ছেদ করে জমি খাস করা—সে হল অনেক কথার কথা। মবলগ টাকা খরচা—তার উপর তদ্বিরতাগাদা।

দেড় বলে যে কথাটুকু উহ্য রাখল, সে হল লক্ষ। দেড় লক্ষ অবধি বাগানবাড়ির দর উঠত, দালাল বলছে তাই। মস্তবড় ক্ষতি সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁর পাঁঠা তিনি যদি লেজে কাটেন, পুলিনের কোন এক্তিয়ার আছে বলবার? বিনয়টা রয়েছে দেখা-শোনার জন্য। কী চোখে দেখেছেন রঞ্জিত—এক হাজার টাকা ডাহা চুরি করল, মার্জনা অমনি সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারেও হয়তো বিনয়ের যোগসাজস আছে, ভাল রকম টাকাকড়ি খেয়ে আপসে

কটক খুলে দেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু রঞ্জিত রায়কে সে কথা বলতে যাবে কে? বলে হয়তো উল্টো-উৎপত্তি—বিনয়ের মাইনে যা আছে, বিশ টাকা আরও বাড়িয়ে দেবেন তার উপরে।

লোকটা যে কারণে এতখানি পথ চলে এসেছে—বলে, সস্তা-গণ্ডায় দিতে রাজি হন তো ডেভিড সাহেবকে এখনো বলে দেখতে পারি। সাহেবের হাতে অনেক ক্ষমতা, নয়া-দিল্লীর কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম। রায়মশায় আর ডেভিড দু-জনে একসঙ্গে লাগলে রিফিউজি তাড়াতে দেরি হবে না। কথাটা জেনে রাখবেন তাঁর কাছ থেকে, আমি আবার আসব।

নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ টিপে বলে, বলবেন কিন্তু ভাল করে। সাহেব আপনাকেও খুশি করবেন, কথা দিয়ে যাচ্ছি।

পুলিনবিহারী চটে উঠল: বলছ কি তুমি—ঘুষ? যেমন আর দশটা অফিসার দেখে থাক, আমাকেও তাই ভেবেছ? রঞ্জিত রায় আমার ভাই—সাক্ষাৎ মামাতো-পিসতুতো ভাই আমরা। একলা সব দিক পেরে ওঠেন না, আমি কিছু কিছু সাহায্য করি। দাদার খাতিরেই চাকরি নিলুম। নইলে এতখানি লেখাপড়া শিখে এসব কাজ করবার কথা নয়।

সাহায্যই করুন তবে দাদাকে। সবসুদ্ধ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে—ডেভিড কিছু তো দেবে। সেটা নেহাৎ হেলাফেলার হবে না। শুধু-হাতে একেবারে মুফতে সাহায্য করতে চান, তাতেও আমরা গররাজি নই। সেটা হল আপনার বিবেচনা।

লোকটা চলে গেল। খানিক পরে বিনয় এসে পড়ে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে পুলিনবিহারী কলরব করে ওঠে: বলতে হবে না। খবর উড়ে এসেছে।

মুচকি হেসে রসিকতা করে বলে, দমদম থেকে পাখি উড়তে উড়তে

এসেছিল। সেই সমস্ত বলে গেল। গুহ্যকথাও বলেছে অনেক, তোমার মুখে যা-সমস্ত পাওয়া যেত না।

মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব বুঝে নিচ্ছে বিনয়ের : বলে কি জান? তোমার বাড়ি পূর্ব-বাংলায়, যারা এসে দখল করেছে তারাও সেখানকার। তোমাদের জানাশোনা নাকি আগে থেকে, মুখ-শোঁকাশুঁকি আছে।

বিনয়ের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। দেখে পুলিনের বড় তৃপ্তি। ছিপে মাছ গেঁথে ফেলে খেলিয়ে আনতে মজা লাগে। সুতোয় কখনো ঢিল দেবে, কখনো টান। বলে, কিন্তু পূর্ব-বাংলা তো একটুখানি জায়গা নয়, আমাদের এই বাংলার ডবল। পূর্ব-বাংলার হলেই সব মানুষ সকলকে চিনবে, তার কোন মানে আছে? বড়বাবু কি করবেন জানিনে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে। বাজে কথা।

ধপ করে বসে পড়ে বিনয় জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, বড়বাবু কোথায়?

পুলিন বলে, কাল অতরাত্রি অবধি হৈ-চৈ গেল। ঘুম আর কতটুকু হয়েছে। কোথায় একটু বিশ্রাম নেবেন—তা নয়, সকালে উঠে ইলু-নীলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এখনো ফেরেননি। তেতে-পুড়ে ক্ষিধেতেষ্টায় আধখানা হয়ে তো ফিরবেন—সেই মুখে এ খবর শুনে ক্ষেপে যাবেন একেবারে। কী যে হবে, জানিনে।

খবর নিজ মুখে না দিলে সন্দেহের কারণ পড়বে, বিনয় সেই জন্য চলে এসেছে। রঞ্জিত রায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, যত ভাবছে ততই আতঙ্ক লাগে। ভাগ্য ভাল, নেই তিনি এখন বাড়িতে। ক'মাস আগে এইখানে এসেই উপযাচক হয়ে আর এক অপরাধের কথা বলে গিয়েছিল। এখন অবস্থা আলাদা। বুড়ো বাপ চাকরি খুইয়ে বেকার অবস্থায় জামাইয়ের বাড়ি পড়ে আছেন। জামাইয়ের ভাই কলকাতা থেকে পড়ে, মাসে মাসে বিনয় তাকে টাকা দিয়ে আসে। সেই খাতিরে জামাই বাবাজী পূর্বপক্ষের শ্বশুরকে বাড়ি

থাকতে দিয়েছে। এবং আদর-যত্নও যে না করে, এমন নয়। টাকা বন্ধ হয়ে গেলে আদর-যত্ন উপে গিয়ে নির্ঘাৎ হরিবিলাসকে পথে বের করে দেবে। তার উপরে একটা বড় প্রত্যাশা রয়েছে—কলিয়ারির ঝামেলা চুকে গেলে এই জায়গায় বিস্কুটের ফ্যাক্টরি হবে। তার যাবতীয় দায়িত্ব বিনয়ের উপর, রঞ্জিত রায় বলে রেখেছেন। কিন্তু পর পর দু-বার মারাত্মক অপরাধের পর কিছুই আর হবে না। ভবিষ্যৎ অন্ধকার বিনয়ের।

উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় বলে, যাচ্ছি আমি। সন্ধ্যের দিকে আবার আসব। বলবেন বড়বাবুকে।

রঞ্জিতের কোন প্রশ্নের কি রকম জবাব দেবে, ধীরেসুস্থে আগে থেকে সমস্ত ভেবে রাখবে। মাস্টারমশায় সদাশিবের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। মাস্টারমশায়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দিতে পারবে হয়তো বাঁশি—বাঁশির সঙ্গেও পরামর্শ করবে। বিনয়ের এখন সবচেয়ে বড় ভয়, ঘাবড়ে গিয়ে ভিতরের কথা নিজেই সব বলে না ফেলে।

পুলিন বলে, থানায় খবর দিয়েছ? তা-ও বোধহয় হয় নি। যাবার মুখে এই কাজটুকু অন্তত করে যেও।

রঞ্জিত রায় অনেক বেলা করে ফিরলেন। প্রায় একটা। অফিসঘরে ঢুকলেন একবার। কথা তো পুলিনের ঠোঁট অবধি এগিয়ে এসে আছে, কিন্তু বলবার ফুরসত কই? রঞ্জিত বললেন, চারটের গাড়িতে পাটনা রওনা হচ্ছি। পরশুদিন মামলা, মামলার কাগজপত্তর সব গুছিয়ে রেখে দাও। এক্ষুনি করতে বলছি না, খেয়েদেয়ে তারপর।

হাত উল্টে ঘড়ির দিকে একবার নজর ফেলে বললেন, বড্ড বেলা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তোমরা সব কী—বসে রয়েছ বুঝি আমার

জন্যে ? কোন দরকার ছিল না, খেয়ে নিলে পারতে। চলে এস তাড়াতাড়ি। হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে আমি যাচ্ছি।

না খেয়ে এই বেলা অবধি অপেক্ষা করে আছে, রঞ্জিত সেটা লক্ষ্য করেছেন। এই নিয়ে অতএব কয়েকটা ভাল ভাল কথা শোনানো যেতে পারে। পুলিন বলে, কলকাতায় এখন থাকেন কোথা—ক'টা দিন বা একসঙ্গে খাওয়া যায়! তাই ভাবলুম, সুযোগ যখন হয়েছে—

কিন্তু বলছে কাকে! রঞ্জিত ঘরে আর নেই, ঝড়ের মতন বেরিয়ে পড়েছেন। খেতে বসে সেই সময়টা ফাঁক পাওয়া গেল। তিন জনে পাশাপাশি খাচ্ছেন—রঞ্জিত ও ইন্দ্রজিত দু-ভাই, আর পুলিন। দায়ে পড়ে পুলিন চাকরি করছে, তবু সে আত্মীয়জন। এবং মর্যাদায় বড়। তাই গিয়ে অন্তরঙ্গ মহলে সে দেমাক করে : শহরের আদি-বাসিন্দা আমরা—নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা দখল করলেন, তার আগে থেকে বসতি। চাঁপাতলা-গলির অর্ধেক জায়গাজমি ছিল আমাদের। আর ঐ রায়েদের বসবাস বনগাঁয়—সে হিসাবে অর্ধেক বাঙাল তো বটেই। বনগাঁর রায়চৌধুরি ওঁরা। রঞ্জিত রায়ের ঠাকুরদা ভবানীপুর কেঠোকুঠিতে সামান্য কাঠের আড়ত করে ছোট-গঙ্গার ধারে বাসা নিলেন। বেলেঘাটায় খড়ের গোলা করলেন রঞ্জিত রায় ; তার পরে বোন-মিল। তাঁর আমলেই ব্যবসা ফেঁপে উঠল। আঙুল ফুলে কলাগাছ। টাকা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সে বনেদিয়ানা পাবেন কোথা ? অদৃষ্ট দেখ—অদৃষ্ট ছাড়া কী আর বলি!—লেখাপড়া শিখে অনার্স-গ্রাজুয়েট হয়ে ওঁদেরই বাড়ি আমি আজ কলম ঘষে খাই।

পুলিন এমনি সব দুঃখ করে নিভৃতে ঘনিষ্ঠ জনের কাছে। সত্যি হয়তো তাই। মনিবের ব্যবহারেও নিতান্ত আপনজনের ভাব। দুই ভাই আছেন রঞ্জিত আর ইন্দ্রজিত, তার উপরে যেন আরও একটি ভাই—পুলিন।

খেতে খেতে পুলিন বলে, বিষম এক কাণ্ড হয়েছে দাদা।

মুখ তুলে রঞ্জিত তাকিয়ে পড়েন। ইন্দ্রজিতও আহার বন্ধ করেছে।

দমদমের বাগানবাড়ি রিফিউজি ঢুকে পড়েছে। কাল রাত্রে।

রঞ্জিত একটুখানি চুপ থেকে বলেন, বিনয়টা যে এইখানে পড়ে ছিল, ও থাকলে হত না। খাওয়াদাওয়া সারা হতে রাত বেশি হয়ে গেল, যায় কেমন করে? গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া যেত অবিশ্যি, সেইটে উচিত ছিল। কিন্তু এমন হবে কে ভাবতে পেরেছে? এক হিসাবে ভালই হয়েছে বোধহয়। গোঁয়ার্তুমি করে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ত, তখন কি আর আস্ত রাখত ওকে! একলা মানুষ অতজনকে কী করে সামাল দেবে? হয়তো বা খুনই হয়ে যেত।

আবার বলেন, একলা মানুষ না বলতে চাও, সোয়াখানা মানুষ। বুড়ো রঘুমণি সিকির বেশি নয়।

নাও, কী কথার উপর কী জবাব! এত বড় সম্পত্তি বেদখল, মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়ার কথা, রসিকতার বচন আসছে এখন মুখে। বড়ভাই ছোটভাই দুজনেই সমান এদিক দিয়ে। ইন্দ্রজিত আধ মিনিট কাল ভোজন বন্ধ রেখেছিল, টপাটপ গ্রাস মুখে তুলে ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে।

পুলিনবিহারী তা বলে নিরস্ত হতে পারে না: বিনয় এসেছিল দাদা, না এলে নিতান্ত খারাপ দেখায়, তাই বোধ হয় এসেছিল একবার। ডেভিডের লোক তার আগেই এসে খবর দিয়ে গেছে। বিনয়কে বললুম, দাদা আসুন, ইন্দ্র আসুন—এক্ষুনি ওঁরা এসে যাবেন, আর কতক্ষণ! বসে যাও তুমি একটু। বাবু মোটে কানেই নিল না, সন্ধ্যাবেলা আসব বলে উঠে পড়ল।

রঞ্জিত বললেন, সন্ধ্যাবেলা আমি থাকছি কোথা! চারটের আগেই বেরিয়ে পড়ছি। পাটনার কাজ সেরে তার পরে ঝরিয়া

যাব। কলিয়ারির ভিতরেও নানান গণ্ডগোল। যে রকম ব্যাপার, মাসখানেকের আগে কলকাতা ফিরতে পারব বলে মনে হয় না।

পুলিন বলে, সেই কথাই বললুম বিনয়কে। দাদা এই এসেছেন— কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েন, ঠিকঠিকানা নেই। তোমার মুখে শুনে নিয়ে যা-হোক ব্যবস্থা করে যাবেন। এত বড় সম্পত্তি গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে মনের সুখে ভোগদখল করবে, কেমন করে তা সহ্য হয়।

এবারে রঞ্জিতকে কিছু উত্তপ্ত দেখা গেল: নিয়ে নিলেই হল! ডেভিড সাহেবকে দিলাম না, ঐখানে আমরা ফ্যাক্টরি গড়ব। ডেভিড সামনের জায়গায় আসছে, খুব ভাল কথা, পাল্লাপাল্লি চলবে—কাদের জিনিস ভাল হয়, কোন ফ্যাক্টরির নামডাক হয় বেশি। দেশি মানুষ না বিদেশি সাহেব—কারা জেতে, না দেখে ছাড়ছিনে। কলিয়ারির ঝামেলাগুলো মিটলে হয়, তখন নিজে গিয়ে ঐখানে চেপে বসি। রিফিউজি আর যেখানে খুশি দখল করুক গিয়ে, বাগানবাড়ি থেকে তাড়াবই। আমি যে অনেক-কিছু ভেবে রেখেছি।

পুলিন বলে, তাড়াচ্ছে কে? একমাস থাকছেন না তো আপনি। আমি না থাকি, টাকাকড়ি লোকজন সব থাকছে। তুমি রইলে, বিনয় আছে। কম কিসে তোমরা?

ইন্দ্রজিতের দিকে এক নজর তাকিয়ে হাসিমুখে বলেন, আর তোমাদের ছোটবাবু রইল—ওকে ছেড়ে দিও না এবারে। নিতান্ত ছোটটি নস—কতদিন ফাঁকে ফাঁকে থাকবি রে এমন? কিছু দায়িত্বভার নিয়ে নে। বুঝলে পুলিন, ছোটবাবুকেও নিয়ে নেবে তোমাদের সঙ্গে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ আহার চলল। পুলিন মৃদুস্বরে আবার বলে, একটা কথা বলি দাদা। বিনয়ের উপর সন্দেহ আসে। নেহাৎ

আন্দাজি কথা নয়, খবরাখবর নিয়েছি অনেক-কিছু। ঐ যত রিফিউজি ঢুকেছে, তারা সব বাঙাল-দেশের লোক।
রঞ্জিত হেসে উঠলেন : উঃ, মস্ত খবর জোগাড় করেছ তো! বাঙাল-দেশের লোক রিফিউজি হয়ে এসেছে। বলি, এ-বাংলার লোকের কী দায় পড়েছে—কোন দুঃখে এরা রিফিউজি হয়ে পরের সম্পত্তি জবরদখল করতে যাবে?
পুলিন স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, মানে, বিনয়ও বাঙাল-দেশের কিনা! রিফিউজিদের সঙ্গে যোগসাজস থাকা অসম্ভব নয়। আগে না থাকলেও পরে হয়েছে নিশ্চয়। এই ব্যাপারে তার যতখানি চাড় হওয়া উচিত, তেমন-কিছু দেখলুম না। থানায় একটা খবর পর্যন্ত দেয় নি। সন্দেহ এই সব কারণে। নিতান্ত অসম্ভবও নয়—মাইনে অল্প, কিছু পান-টান খেয়ে থাকতে পারে ওদের কাছ থেকে। তাই মনে হয় দাদা, বিনয়ের উপর নির্ভর করা উচিত হবে না।
বলছে আর আড়চোখে নিরীক্ষণ করছে রঞ্জিতকে। রঞ্জিত ঘাড় নাড়ছেন। কী মন্ত্রে বশ করেছে, বিনয়ের কোন দোষ উনি দেখতে পান না। নিজের মুখে দোষ স্বীকার করলেও সঙ্গে সঙ্গে মাপ হয়ে যায়। তখন পুলিন আর একভাবে শুরু করে : অতদূর না-ও যদি হয়, বিনয়ের কাজের হেলা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকগুলো ঢুকে পড়বার আগে নিশ্চয় দেখেশুনে গেছে, আশে-পাশে ঘোরাফেরা করেছে। সেদিকে নজর রাখা উচিত ছিল তার যখন কাজই এই। কাজ ভাল করে করবে বলে ঐ জায়গায় তাকে বাসা দেওয়া হয়েছে।
রঞ্জিত গম্ভীর হয়ে বলেন, অবহেলার কথা যদি বল, সেটা আমার। পুরোপুরি আমারই। জয়ন্তী-প্রেস তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য-কিছু করা উচিত ছিল। ছোটখাট আয়োজনেও বিস্কুট-ফ্যাক্টরির পত্তন করতে পারতাম। ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে বড় হত। এখনকার এই দিনে অতটা জায়গা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু

দোষের বিচার পরে করলেও চলবে। বাগানের উদ্ধার কেমন করে হয়, সেই ভাবনা ভাব এখন।

ইন্দ্রজিত চুপচাপ এতক্ষণ খেয়ে যাচ্ছিল। মুখ তুলে হঠাৎ প্রশ্ন করে, মানুষ কত এসে পড়েছে?

পুলিন বলে, গণে তো আসেনি কেউ। বিনয়ের কাছে যা শুনলুম আর সেই দালাল লোকটা যেরকম বলল, পঞ্চাশ-ষাট জন হতে পারে।

ইন্দ্রজিত বলে, বেশিটাই ধরে নেওয়া যাক—ষাট।

বিড়বিড় করে কি হিসাব করে। বাঁ-হাতের কর গণে কতকগুলো নামের হিসাব করছে—বিশে-বোদে-অশোক-জানকী···

তারপর বলে, বাগানের উদ্ধার এক ঘন্টার ব্যাপার পুলিন-দা। কোন ভাবনা নেই। বিশে-বোদে-অশোক ওদের বার জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ বারং ষাট—এক একজনে গড়ে পাঁচটা রিফিউজির মহড়া নেবে। কাল রাত্রে ঘরবাড়ি তুলেছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত আবার ফরসা। কাল সকালে আমরা গিয়ে নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধন করে আসব।

রঞ্জিত শশব্যস্তে বলেন, ওরে বাবা! কাজ নেই তোর বাগান উদ্ধার করে। শুনছ হে পুলিন? ছোটবাবুকে তোমাদের মধ্যে নিতে বলেছিলে—গিয়ে তো মার-মার কাট-কাট করবে। কাজ নেই, ওকে টেনো না। বিনয়ের উপর যদি সন্দেহ—একই জায়গার মানুষ পথে পড়ে উঞ্ছবৃত্তি করছে, সহানুভূতি আসা খুব স্বাভাবিক। কিছু দোষেরও নয় সেটা। বিনয়কেও বাদ দিয়ে দাও তাহলে। একলা তুমি। তোমার অনেক কলকৌশল, সেই সমস্ত খাটিয়ে দেখগে। গোলমালে কাজ নেই—কলিয়ারিতে এই চলছে, সকল দিকে মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে সামলানো যাবে না। মিষ্টিকথায় বুঝিয়েসুজিয়ে দেখ। বিশ-পঞ্চাশ করে টাকা নিয়ে আপসে যদি চলে যায়, সেইটে সব চেয়ে ভাল। তুমি নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে—কেমন?

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছেন। মামলার কাগজপত্র বাছাবাছি এইবার। তার মধ্যে একবার ছোটভাইকে ডেকে রঞ্জিত বললেন, কী রকম ঝঞ্ঝাট জড়িয়ে নিয়েছি দেখ ইন্দ্র। রন্টুর পেট কেঁপেছে বলে শাশুড়ীঠাকরুন তাকে নিয়ে কাল সকাল সকাল চলে গেলেন। ছেলেটা কেমন আছে একটিবার দেখে আসব, কিছুতে তার সময় হল না। নেবুতলায় গিয়ে খবর নিয়ে পাটনার ঠিকানায় আমায় চিঠি দিস। আর ইলু-নীলুর কী সব বইয়ের দরকার, লিষ্টি দেখে কিনে দিবি সেগুলো।

॥ তের ॥

সন্ধ্যাবেলা বিনয় আবার এসেছে। পুলিন বলে, নেই দাদা। পাটনায় রওনা হয়ে গেছেন। বলছি আমি কাকে, সেটা কি আর ভাল করে না জেনেশুনে তুমি এসেছ!

বিনয় সবিস্ময়ে বলে, কেন, বড়বাবু চলে গেলে তবে আমি আসব, একথা কেন বলছেন?

পুলিন বলে, এত বড় ক্ষতির কারণ হয়ে কোন সাহসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবে! তুমি না বললেও খবর পৌঁছতে বাকি নেই। দাদা তো রেগে টং। বলি, থানায় ডায়েরি করা হয়ে গেছে? কি বলে তারা?

ও. সি.-র দেখলাম বড়বাবুর সঙ্গে জানাশোনা আছে। খাতির দেখালেন খুব। তাঁদের যা সাধ্য, নিশ্চয় তাঁরা করবেন।

পুলিন ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাদের সাধ্য ঘোড়ার ডিম। তাদের ভরসায় আছি কিনা! আইনে বলে ডায়েরি করতে, আইনের মান রাখা হল। দাদা নাকে-মুখে দুটো গুঁজে তক্ষুনি লালবাজারে বেরিয়ে গেলেন। মুষল সেখানে তৈরি হচ্ছে।

হাতে-নাতে প্রমাণ না থাকুক পুলিন নিঃসংশয়ে জানে, এখানকার

যাবতীয় কথাবার্তা বিনয়ের সেই দেশোয়ালি রিফিউজিগুলোর কানে পৌঁছে যাবে। ইচ্ছে করে তাই গরম গরম বলছে—ক্ষেত্রটা তৈরি হয়ে থাকুক পুলিনের গিয়ে পড়বার আগে।

বলে, তবে কি জান, এতখানি লেখাপড়া শিখে দাঙ্গাহাঙ্গামা-রক্তপাত তেমন আমি পছন্দ করিনে। ঐগুলো এড়ানো যায় যদি কোন রকমে। দাদার বাইরে চলে যেতে হল, এই রক্ষে। তিনি থাকলে এতক্ষণে ধুন্দুমার লেগে যেত। কাল সকালে আমি বাগানে যাচ্ছি। আপসে বিদায় হবে কিনা, কথাটা জিজ্ঞাসা করে আসব। খুব বেশি তো এক হপ্তা, তার ভিতরে বাগান খালি করে দিতে হবে। সাতের বেশি আট দিন হলে হবে না। বলবে তোমার এয়ারবন্ধুদের।

বিনয়ের গলায় জোর নেই মোটে। মিনমিন করে প্রতিবাদ করে: এয়ারবন্ধু কেন হতে যাবে?

হেসে উঠে পুলিন বলে, আচ্ছা, না-ই হল এয়ারবন্ধু। দুশমন পয়লা নম্বরের। সেই দুশমন মশায়দের আমি একটা সুযোগ দিলুম। না শুনলে তারপরে ভালমন্দর জন্য আমাকে দোষ দেবে না কিন্তু।

বাগানে ফিরে বিনয় সোজা গিয়ে পাকাবাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। সদাশিবকে বলে, শুনুন মাস্টারমশায়, বড় সঙিন অবস্থা। অশ্বিনীকে বলে, আপনাকে লাঞ্ছনা করবে জেঠামশায়, সে আমি চোখে দেখব কেমন করে?

বারান্দায় নয়, দরদালানেও নয়, একেবারে ভিতরের কামরায় গিয়ে বসলেন সকলে। সকালবেলা পুলিন আসছে—তার কথায় কি জবাব, এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে। গোপন পরামর্শ। কলোনির গোঁয়ারগোবিন্দগুলোকে জানতে দেওয়া হবে না আপাতত। নানা জনে নানা মন্তব্য করবে, অবস্থা জটিল হবে, শান্তভাবে সকল দিক বিবেচনা করা যাবে না। নিজেদের

মধ্যে একটা-কিছু সাব্যস্ত হোক, বাইরের ওরা তারপর জানবে।

আশিসের পাত্তা নেই। কোনদিকে বেরিয়ে গেছে। কোথায় আবার। কোন এক চালাঘরে উঠে বসে গৃহস্থকে সাহস দিচ্ছে। কিম্বা সমস্ত রাত্রি জেগে পাহারা দিয়ে ঘুরবে, তার ব্যবস্থায় আছে। আশিসকে একটিবার নিয়ে আসা দরকার। সে হল মূল-পাণ্ডা, তাকে বাদ দিয়ে কিছুই পাকা হবে না।

বাঁশি উঠে দাঁড়ায়ঃ আমি যাচ্ছি। নীরেন-দা'র বাড়ি আছে ঠিক, আমি গিয়ে ডেকে আনি।

বিরজা তাড়া দিয়ে ওঠেনঃ এই রাত্তিরে ম্যাচম্যাচ করে যেতে হবে না তোর। নতুন জায়গা, শত্তুর চারিদিকে, ভয়ও করে না একটু! তারপরে যেন বাঘ দেখেছেন, এমনি ভাবে শিউরে ওঠেনঃ দালানের দরজা কে খুলে রেখেছে? কী বলা আছে আমার— সন্ধ্যের পর ভাল করে দেখেশুনে তবে দরজা খুলবে, খিল-খোলা অবস্থায় কখনো থাকবে না। যে খুলবে সে-ই বন্ধ করে তবে নড়বে জায়গা থেকে। বিভূঁই জায়গায় একখানা কাণ্ড ঘটে গেলে তখন কি?

দরজা খুলেছেন অপর কেউ নয়—সদাশিব। বিনয়ের ডাক শুনে খুলে দিয়েছিলেন। তার কথা শুনতে শুনতে পরে আর খিল দেবার খেয়াল হয় নি। বেকুব হয়ে গেলেন তিনি।

বিনয় বলে, আশিস-দাকে আমি ডেকে আনছি। সত্যিই তাকে দরকার—সে ছাড়া হবে না।

আশিস এলে সদাশিব বলেন, জায়গা দেখ আশিস। তাড়াতাড়ি। সমস্ত শুনে নিয়ে আশিস শান্ত কণ্ঠে বলে, জায়গা বদলে লাভটা কি মাস্টারমশায়? যেখানেই যাই, কোন মালিক 'আসুন' 'বসুন' করে আহ্বান করবে না। লড়ালড়ি চলবেই। সে লড়াই এখানে হোক আর অন্য কোথাও হোক, একই তো ব্যাপার।

সদাশিব দৃঢ়স্বরে বলেন, ব্যাপার এক নয়। সেই নতুন জায়গায় বিনয় নেই। বিনয়ের উপর দোষ পড়বে না। আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিনয় বিপদে পড়েছে। তাকে বাঁচাবার জন্য এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।

বিরজা এর মধ্যে কথা বলে ওঠেন : যেতে পারি যদি এমনি পাকা-দালান পাই কোথাও। মাগো মা, রাত হলে প্রাণে আর জল থাকে না। দালানের দুয়োর এঁটে তবু অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

আশিস হেসে বলে, আর পুকুরের কথাটা বললে না পিসিমা? দুয়োর খুলেই বড়-পুকুর। সোনাটিকারি থাকতে দিনে যদি দশবার নাইতে, এখানে এসে সেটা বিশবার হচ্ছে।

অশ্বিনী চিন্তা করছিলেন। বলে উঠলেন, সত্যি কথা, দিদির কথা বড় সত্যি। যেখানে সেখানে উঠতে পারিনে আমরা এই এদের সব নিয়ে। রাজবাড়ির মানইজ্জতের কথা বলিনে, সে জিনিস ওপারে ফেলে এসেছি। বলছি বাঁশির কথা। শিব-দাদা বলেন কাঞ্চনবরণী, আমার কাছে কণ্টকবতী। বুকে কাঁটা, পিঠে কাঁটা— শুতে বসতে খচখচ করে ফোটে। মেয়ে না থাকলে এই মুহূর্তে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম। মাঠে-ময়দানে পড়ে থাকতাম। আর্মড-পুলিস আসুক বা না আসুক, চেঁচিয়ে একটা শক্ত কথা বললেই তো আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। শুনিনি তো কখনো কারও কাছে। তার উপরে বিনয়ের ব্যাপার—ডেকে নিয়ে এসে বিনয় এখন দোষী হয়ে পড়ছে। তার কথা ভাবতে হবে বই কি। চার দিনের কড়ারে এসেছি—চার দিন না-ই হল, যেতে আমাদের হবেই। যত তাড়াতাড়ি হয়, তত ভাল। আশিস তুমি জায়গা দেখ। ভাল জায়গা শুধু এই একটিমাত্র আছে, এমন তো নয়।

আশিস বলে, জায়গা না হয় দেখলাম বাবা। পেলামও ধর ভাল জায়গা। কিন্তু যেতে হলে একলা আমাদের এই একটা ঘরই শুধু যাবে। অন্য কেউ নড়বে না এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে।

পাকাবাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাব, ওরাই তখন এসে দখল করবে। বিনয়ের অবস্থায় তাতে ইতরবিশেষ হবে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক আলোচনা হল। সমাধান কিছুতে হয় না। দেখবে অবশ্য আশিস জায়গা। এমন দালানকোঠা, এমনি স্নানের সুবিধা ও খাবার জলের প্রাচুর্য, তার উপরে ফলসা গাছগাছালির বাগান সাজিয়ে, হতে পারে, কেউ রিফিউজির অপেক্ষায় খালি অবস্থায় রেখে দিয়েছে। দেখবে নিশ্চয় তেমনি কোন জায়গা খোঁজাখুঁজি করে।

অনেক রাত্রে কথাবার্তার শেষে বিনয় উঠল। দরজা খুলে দেবার জন্য বাঁশি দরদালানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় বলে, সকলের সব কথা শুনলে, আমার কথাটা শুনে যাও বিনয়-দা। জায়গা পেলেও আমি কিন্তু যাব না। সকলে যায় যাক, আমি থেকে যাব।

বিনয় বলে, জোর-জবরদস্তি করে তাড়াবে। রঞ্জিত রায়ের অনেক ক্ষমতা, বিস্তর লোকজন হাতে।

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বাঁশি বলে, আসুক না তাড়াতে। কথা রইল তাই—জোর করে যখন তাড়িয়ে দেবে, ঘর ছাড়ব সেই দিন। তার আগে কখনো নয়।

ঠিক আসবে দেখো। লোকজন এসে জিনিসপত্র দমাদম ছুঁড়ে ফেলবে। সে বড় কেলেঙ্কারি। তোমাদের তাড়িয়ে বের করছে, সে জিনিস আমি চোখে দেখব কেমন করে ?

বাঁশি বলে, চোখ বন্ধ করে থেকো বিনয়-দা। কিম্বা বীরের মতো সরে পোড়ো। তাহলে চোখে দেখতে হবে না।

কেটে কেটে বাঁশি বলে যাচ্ছে, জন্মেছিলাম মস্তবড় অট্টালিকায়। অট্টালিকা ছেড়ে শিয়ালদা স্টেশনে উঠলাম। তাকিয়ে দেখতাম, তারও ছাদ অনেক উঁচু, ঘর অনেক—অনেক বড়। আবার এই যেখানটায় নিয়ে এলে—হাল-ফ্যাশানের ঝকঝকে বাড়ি,

ডিসটেমপার-করা ঘর। ভাল ঘরে থাকার কপাল করে এসেছি আমি, নড়বড়ে এঁদোঘরে কক্ষনো আমি যাব না।

বাঁশি হাসে কি কাঁদে বোঝা যায় না। বলে, দেখ, লাঠি-বন্দুক এনে যেদিন তাড়িয়ে দেবে, বেরিয়ে এসে পুকুরঘাটের পাকা রানায়ের উপর থেকে ঝপ্‌পাস করে জলে পড়ব। গাঁয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম, মনে আছে বিনয়-দা? ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবসাঁতার দিয়ে অনেক দূরে ভেসে উঠতাম। এখানে আর ভাসব না, ডুবে থাকব। ভেসে উঠলে দেখবে, আমি আর নেই। পচে ফুলে ঢাক হয়ে গিয়ে তখন আমি আর একজন।

॥ চৌদ্দ ॥

পরের দিন পুলিন চলে এসেছে। সঙ্গে রায়বাড়ির পুরনো দরোয়ানটা শুধু। ঘুরে ঘুরে দেখছে চতুর্দিক। এত করে সে ভয় দেখিয়েছিল, বিনয়টা এসে বলেনি কিছু? বাইরের দু-দু'জন জলজ্যান্ত মানুষ, এক জনে তার মধ্যে হাতে-লাঠি ভোজপুরী দরোয়ান, দেখেশুনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নতুন চালাঘরগুলো থেকে চোখ তুলে দেখল কতজনা, পুরুষরা দেখল, মেয়েরা দেখল। কিন্তু নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। যে যার তালে আছে। গরু-ছাগল ঢুকে পাড়ার মধ্যে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে, এমনিতরো ভাব। ভেবে দেখতে গেলে অপমানই তো হচ্ছে এতে।

এরপরে গিয়ে পুলিন পাকাবাড়ির সামনে দাঁড়ায়। এখানে ঠিক উল্টো ব্যাপার। কোন দিকে ছিলেন অশ্বিনী, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন: আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—। চেঁচিয়ে তোলপাড় করছেন।

অশ্বিনীর পাশে সদাশিব। তিনি বলেন, আপনিই তো ম্যানেজারবাবু? পুলিনবাবু আপনি? কী আশ্চর্য, এই কম

বয়সে একটা এস্টেটের ম্যানেজার। ম্যানেজার বলতে আমরা বুঝি কাঁচা-পাকা ভারি একজোড়া গোঁফ মুখের উপরে, মাথাজোড়া টাক, ঢাকাই-জালার সাইজের ভুঁড়ি। তেমনি একজন ছিলেন কি না আমাদের গাঁয়ে। এ ম্যানেজার কচি ছেলে একটি। আমার কত ছাত্র আছে আপনার দেড়া-দুনো বয়সের।

অশ্বিনী ওদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছেন: ওরে বাঁশি, সপটা পেতে দিয়ে যা, ম্যানেজারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, সমস্ত খুইয়ে এসেছি ম্যানেজারবাবু, আজ তাই মাদুর পেতে বসতে দিতে হচ্ছে। সামান্য একটা-দুটো জিনিস যা সঙ্গে এনেছিলাম, বর্ডারে কেড়েকুড়ে নিল। কী করছিস মা তুই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের পা ব্যথা হয়ে গেল যে!

শত্রুপক্ষের লোক নয়—গৃহে যেন আকস্মিকভাবে গুরুঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে। খাতিরযত্ন তেমনি। পুলিন মনে মনে হাসে: বড় সেয়ানা তুমি বুড়ো! এমন বিস্তর দেখা আছে। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। খাতিরে ভুলে যাব তো সকল দিক সামলে ধাঁ-ধাঁ করে রায়-এস্টেটে সকলের উপর ম্যানেজার হতে পারতাম না।

বাঁশি মাদুর এনে বারান্দার উপর পেতে দিল। দেরি অকারণ নয়, একটু সাজগোজ করেছে ইতিমধ্যে। সাজ আর কি, তোলা শাড়ি বের করে পরেছে একটা। মুখখানা সাবানে ধুয়েছে। ফুল দুটো কানে দিয়েছে। এতেই অপরূপ। বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে রাজকন্যা চৌকাঠ পার হয়ে এল।

কি ভাবে কথাটা পাড়বে, মনে মনে পুলিন ঠিক করে এসেছিল। গোলমাল হয়ে যায়। আশ্চর্য রূপসী মেয়ে—এত রূপ কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না। সেই মেয়ে এখানে জঙ্গলপুরীতে এসে পড়েছে। সেইজন্যে তো আরও বেশি করে যাবে চলে, ভিলার্ধ থাকা উচিত নয় এখানে।

বারান্দায় মাদুরের উপর পুলিন ভাল হয়ে বসল। দরোয়ানটা অনতিদূরে ঘাটের সিঁড়িতে। ক্ষণকাল চুপচাপ থেকে সহসা আড়ষ্ট ভাব ভেঙে পুলিন বলে ওঠে, দাদা—মানে এই বাগানবাড়ির মালিক রঞ্জিত রায় বড্ড চটেছেন।
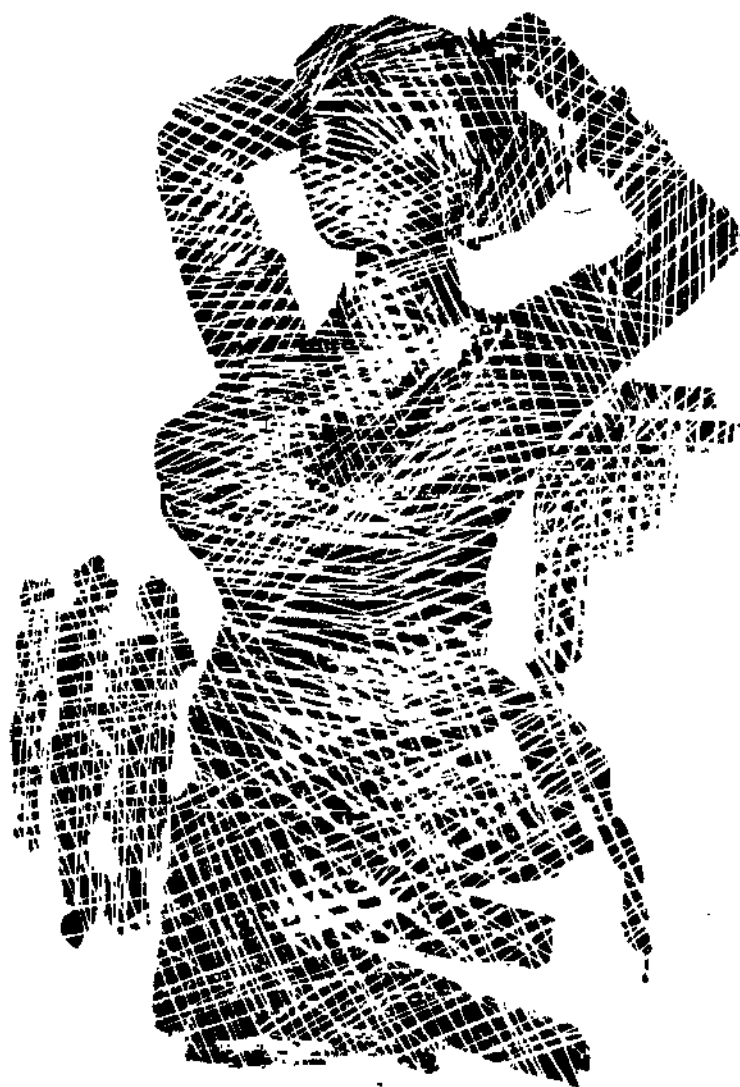
দেরি অকারণ নয়, একটু সাজগোজ করেছে ইতিমধ্যে

অশ্বিনী সন্ত্রস্তভাবে বলেন, কেন চটলেন বাবা? চটবার মতন কি কাজ আমরা করেছি?

না বলেকয়ে এসে উঠেছেন এখানে। ঘর দখল করে আছেন। ছাপাখানা তুলে দিয়ে ঘরগুলো সবেমাত্র এই সেদিন মেরামত শেষ হয়েছে।

অতি নিরীহভাবে অশ্বিনী বলেন, ভাল বাড়ি দেখেই তো এসে উঠলাম বাবা। খোড়োবাড়ি কিম্বা ভাঙাচোরা ঘর হলে কে আসত? শখ করে আসিনি, এসেছি ইজ্জতের দায়ে। ঘরবাড়ি মান-প্রতিপত্তি সমস্ত ছিল আমাদের। রঞ্জিত রায় মশায়ের কথা সঠিক জানিনে। কিন্তু আমাদেরও সম্ভ্রম কিছু কম ছিল না।

সদাশিব মাঝখানে পরিচয় দেন: সত্যিকার রাজা ছিলেন এক সময় এঁরা। বাড়িটাকে এখনো রাজবাড়ি বলে।

অশ্বিনী বলেন, সমস্ত ছেড়ে চলে এলাম। কারো কাছে কোন অন্যায় করিনি যার জন্যে এত বড় সর্বনাশ আমাদের। শিয়ালদা স্টেশনে আস্তানা নিতে হল দশ ভিখারির এক ভিখারি হয়ে। এমনও ছিল অদৃষ্টে!

বলতে বলতে গলা ধরে আসে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সামলে নিলেন অশ্বিনী। এতক্ষণ বলেছেন সমস্ত সত্যিকথা—অন্তর মেলে ধরেছেন বিরুদ্ধপক্ষের মানুষটির কাছে। এবারে ভিন্ন পথ, বিনয়ের উপরের সন্দেহ যাতে ধুয়েমুছে যায়। বলেন, স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দিল, তারপর নানান ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি বাবা। সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে। মেয়ে নয়, দুশমন আমার। শেষটা একজনে খবর দিল, দমদমে অমুক বাগান একেবারে খালি পড়ে রয়েছে, বাগানের মধ্যে পাকাবাড়ি। পাকাবাড়ির নাম শুনেই উচিত-অনুচিত না ভেবে ছুটে এলাম। মেয়ে নিয়ে সামাল-সামাল, আমার বাঁশিকে দেখলেন তো চোখে। মেয়ের ভাবনায় সারা রাত্র দু-চোখ এক করতে পারিনে। এই পাকা-দালানের দুয়োরে

খিল এঁটে দিলে আর যাই হোক বেড়া কেটে ঘরে ঢোকার ভয়টা থাকে না। যেতে বলেন তো এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। কিন্তু কোনখানে গিয়ে উঠব, তার যদি একটা হদিশ দিয়ে দেন। আমরা নতুন মানুষ, কলকাতার শহরে এই প্রথম। জায়গা চিনিনে, মানুষের সঙ্গে চেনা-পরিচয় নেই।

পুলিন মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে, আমায় 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? সঙ্কোচ লাগে।

সদাশিব পরমোৎসাহে সায় দেন: ঠিক তাই। বড্ড ভাল ছেলে তুমি। বড্ড দয়ামায়া, কথা শুনে বুঝতে পারি। আমি কিন্তু ঐ 'আপনি' বলার ভয়েই মুখ বন্ধ করে এতক্ষণ চুপচাপ আছি। মেজরাজা 'আপনি' 'আপনি' করছে, তা যেন কানের মধ্যে শিসে ঢেলে দিচ্ছে আমার।

অশ্বিনী বলেন, যে বাড়ির মানুষ আমরা, চিরদিন মানুষজনকে দিয়েছি ছাড়া হাত পেতে কারও কাছ থেকে নিইনি। সেই আমাদের চোরের মতো রাতারাতি অন্যের জায়গায় ঢুকে পড়তে হল। চলে যাব বাবা, তোমার কাছে কথা দিচ্ছি। দরকারের বেশি এক লহমাও পড়ে থাকব না। মেয়েটার বিয়ে দেব, সেই চেষ্টায় আছি। যেদিন হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে বাগান তোমাদের খালি হয়ে গেছে। আমার ছেলে আশিস হল মাতব্বর, ঐ যারা পাড়া জমিয়ে আছে সকলের বলভরসা। আমরা চলে যাব, পাড়াসুদ্ধ সবাই আমাদের পিছু পিছু যাবে। একটি মানুষ পড়ে থাকবে না। ঘেন্না ধরে গেছে বাবা তোমাদের হিন্দুস্থানের উপর। ভাল জায়গা না জোটে, যে দেশ ছেড়ে এসেছি সেইখানে ফিরে যাব।

সদাশিব হেসে রসিকতা করেন: সেই যে বলে থাকে বারউপোসি গেলেন তেরউপোসির বাড়ি—মানে, বারদিন উপোস করে এক বাড়ি গিয়ে অতিথি হলাম, তারা দেখি তেরদিন খায়নি। আমাদের

ঠিক সেই বৃত্তান্ত। পাকিস্তানে কি-হয় কি-হয়—সেই ভাবনায় পালিয়ে চলে এলাম। ট্রেন থেকে নেমে দেখি, যমরাজ হাঁ করে রয়েছেন—ভাবাভাবির ফুরসত নেই—হাঁ-য়ের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়তে হল। মেজরাজাকে বলি, ঢের হয়েছে, আর কাজ নেই—চল, ফিরে যাই। যেতে কারো অনিচ্ছা নেই। কিন্তু—

পুলিনকেই অশ্বিনী মধ্যস্থ মেনে বসেন: তুমিই বল বাবা, মেয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে? ভাল পাত্তর পাওয়া যায় না পাকিস্তানে, সকলেই তো পার হয়ে চলে এল। সোনার পদ্ম কার হাতে তুলে দেব, বল।

পুলিন বলে, সে কথা ঠিক। মেয়ে দেবার উপযুক্ত পাত্র ওদিকে বেশি পাবেন না। বিয়েথাওয়া দিয়েই তবে চলে যাবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি—ধীরেসুস্থে বাছাবাছি করতে গেলে হবে না। ঐ যে বললুম, দাদা আগুন হয়ে আছেন। ভাগ্যিস এ সময়টা তিনি বাইরে। এ মাসে ফিরছেন না, বোধ হয়। এরই মধ্যে শুভকর্ম সমাপন করে ফেলুন। ফিরে এসে যদি দেখেন বাগান বেদখল করে আছেন, কোনরকমে রক্ষা হবে না। নির্যাতনের চরম হবে আপনাদের উপর। আত্মীয় বলে আমাকেও যে বাদ দেবেন, তা নয়। রেগে গেলে রঞ্জিত রায়ের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, শহরসুদ্ধ লোকে জানে।

অশ্বিনী খপ করে পুলিনের হাত জড়িয়ে ধরেন: কত জানাশোনা তোমার বাবা, আমরা এ জায়গায় নতুন। ভাল চাইনে, একটা চলনসই সম্বন্ধ জুটিয়ে দাও আমার মেয়ের জন্য। যত তাড়াতাড়ি পার। কাল হয়ে যায় তো পরশুদিন নয়। কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে গেলে কিছুই করতে হবে না তোমাদের—মামলা-মোকদ্দমা দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছুই না—আপসে বাগান খালি করে দিয়ে চলে যাব। দু-কথার মানুষ আমি নই। ঐ যত সব এসেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখ।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা চলে। বিয়ের সম্বন্ধ জোটানোর ভার নিচ্ছে পুলিন, ঘরোয়া খবরবাদও অতএব নিতে হয়। কোন জাত কি বৃত্তান্ত—খরচপত্র করা সম্ভব কিনা কিছু, এমনি সব বিবরণ।

অশ্বিনী ঘাড় নেড়ে বললেন, সবই তো বর্ডারে নিয়ে নিল। দিন চালানো মুশকিল, তার খরচপত্র! কোন মহৎ মানুষ মেয়েটা চোখে দেখেই নিয়ে নেন যদি। শুধু শাঁখাশাড়ি দিয়ে সম্প্রদান।

সদাশিব লুফে নিয়ে বলেন, যে মানুষ নেবেন, ঠকবেন না তিনি। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—সেটা শুধু কথার কথা নয়। বাঁশির মতো মেয়ে হয় না।

পুলিন এখন পরম অন্তরঙ্গ। সদাশিবের কথায় উৎসাহ ভরে সে সায় দেয়ঃ তা বটে, তা বটে! আচ্ছা, দেখি আমি খোঁজখবর নিয়ে। পরশু-তরশু আসব আবার। এসে বলব।

চিন্তান্বিত ভাবে পুলিন ফিরে চলেছে। রিফিউজি বলতে পুরোপুরি না হোক অর্ধেক গোছের ভিখারি, এমনি একটা ধারণা ছিল এতদিন। শ্রমবিমুখ মেয়েপুরুষের দল সরকারি ডোলের জন্য হাত পেতে আছে, না পেলে কোলাহল জুড়বে। সম্মানী মানুষে দারিদ্র্য গোপন করে—আর এদের যত না অভাব, আরও বেশি করে জানান দেয়। নিখরচায় আহার চাই, বসবাসের জায়গা চাই। হুমকি দিয়ে সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গের অন্নে ভাগ বসাতে এসেছে, এমনি একটা বিদ্বেষ ছিল মনে মনে। আজকে পুলিন অন্য রকম দেখল। দেবতার মতন রূপ আর আভিজাত্য নিয়ে একটি বিপন্ন পরিবার অকূল-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ফিকফিক করে বাঁশি হাসছে বিনয়ের কাছে গিয়ে। মনে মনে জ্বলেপুড়ে বিনয় বলে, বিয়ের নামেই এত স্ফূর্তি?

বাঁশি বলে, বিয়ে হয়ে গেলে কি কাণ্ড হবে, সেইটে ভেবে

দেখছিলাম। ভাবতে হাসি পেয়ে যায়। বাবার কাছে দেমাক করছিল, কলকাতার আদি-বাসিন্দা ওরা—জঙ্গল কেটে বসতি। কথাবার্তাও এখনো সেই জঙ্গলের বাঘ-ভালুকের মতো। হালুম-হলুম, এলুম-গেলুম। মাগো মা, বিয়ে হলে তো একটা কথাও বলা যাবে না ও-বরের সঙ্গে। বলতে গেলে হাসি পাবে।

সেই ভবিষ্যৎ দিনের কথা মনে করেই বুঝি বাঁশি মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগল। তাতে হল না তো আঁচল সরিয়ে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি। এক চোট হেসে নিয়ে তারপর বলে, তুমিই দায়ী বিনয়-দা। বাগানবাড়ি নিয়ে এসে এই বিপদে ফেলেছ। কী করে ঠেকাবে এখন ভাব।

বিনয় মনে মনে খুশি, পুলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ বাঁশি ভেঙে দিতে বলছে। কিন্তু ক্ষমতা কী আছে তার!

মুখেও তাই বলে, জেঠামশায় নিজে কথাবার্তা তুলেছেন, মাস্টারমশায় আছেন তাঁর সঙ্গে। পিসিমা আর আশিসেরও যদি মত থাকে, তার উপরে আমি কি করতে পারি বল।

বাঁশি অধীর হয়ে বলে, আমার যে অমত।

সেই কথা বল তবে ওঁদের—

বাঁশি বলে, তাই বুঝি বলা যায়! তেমনি বাড়ি কিনা আমাদের! সংসারের ভারবোঝা হয়েছি আমি, বিয়ে হলে বোঝা নামিয়ে সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। তোমাদের ম্যানেজার এমনি তো পাত্র হিসাবে নিন্দের নয়। বাবাকে বলতে গেলে তিনি আগুন হবেন। পিসিমা তেড়ে এসে চুলের মুঠি ধরবেন।

বিনয়ের হাত দুটি ধরে আবদারের সুরে বাঁশি বলে, আমি কিছু পারব না। যা করতে হয় তুমিই কর বিনয়-দা।

বিনয় তো ভেবে কূলকিনারা দেখে না। বলে, আমি অভিভাবক নই বাঁশি, তোমাদের আমি কেউ নই। কর্মচারীর ছেলে হিসাবে

একটু সম্বন্ধ ছিল, তা-ও ঘুচে গেছে। কিসের জোরে কি করি বল? কতটুকুই বা ক্ষমতা আমার!

স্তব্ধ হয়ে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থাকে বাঁশি। তারপরে বলে উঠল, করতে হবে না কিছু বিনয়-দা। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে। বিয়ের নেমন্তন্ন পাবে—আশ্রয়দাতা উপকারী মানুষ, তোমার নাম লিস্টি থেকে বাদ পড়বে না। আমি নিজে গিয়ে বলে আসব। বিয়ে দেখো আমার, ভরপেট নেমন্তন্ন খেও।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাঁশি একরকম ছুটে বেরুল।

তারপরেও বিনয় ভাবছে। সারাদিন ধরে অনেকরকম ভেবেছে। আজব কাণ্ড রে বাবা! বড়বাবু নেই বলেই রিফিউজি তাড়ানোর ভার পুলিনের উপরে। সেই সূত্রে এখানে তার আসা-যাওয়া। কিন্তু জবরদখল কলোনি এই একটা মাত্র নয়। শহরতলীর যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা, রাতারাতি সেখানে কলোনি গজিয়ে উঠছে। দু-পক্ষে গোলমাল—এরা তড়পায়, ওরা তড়পায়। চাই কি আদালতে ফৌজদারি-দেওয়ানি রুজু হয়ে গেল দু-পাঁচ নম্বর। মালিকের লোক এল তো ঝগড়াঝাঁটি দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে এসে। এখানে উল্টো ব্যাপার। মালিকের লোক মাদুর পেতে আসর জমিয়ে বসে ভাব জমায়। ভাব বলে ভাব, মেয়ে বিয়ে করে জামাই হবার চক্রান্ত। বড়বাবু নেই বলেই এমন অরাজকতা। এতদূর সেই জন্যে সাহস করছে।

ভাবতে গিয়ে মনে হল, বড়বাবু নেই—ছোটবাবু তো রয়েছে। ছোট ভাই ইন্দ্রজিত কাঁচা-খেগো দেবতা—এক কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি কাজ করানোর পক্ষে এই মানুষ ভাল। অনেক ভাল রঞ্জিত রায়ের চেয়ে।

সমস্ত রাত্রি বিনয় নানান মতলব ফেঁদেছে। ভোরে উঠে চলল সে ভবানীপুর।

রাত থাকতে উঠে ইন্দ্রজিত কুস্তির আখড়ায় চলে যায়। বোদে বিশে অশোক জানকী এবং আরও বহু সাগরেদ সেই আখড়ায়। ল্যাঙট পরে খালিগায়ে মাটি মেখে কুস্তি করে।

বিনয় সোজা আখড়ায় গিয়ে উঠল। বাইরের লোকের এখানে আসতে মানা। চটে গিয়েছে ইন্দ্রজিত। পেশীবহুল দৃঢ় দেহ—রক্ত-মাংসে নয়, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। দৈত্যের মতো এগিয়ে এসে গর্জন করে উঠল : কার হুকুমে তুমি এখানে এলে ?

হকচকিয়ে যায় বিনয়—মুহূর্তকাল। কিন্তু বিপদের মুখে বুদ্ধি খুলে গেল। কাতর হয়ে বলে, ছোটবাবু, বড়বাবু বাইরে—আপনিই আমাদের মাথা এখন। আপনি ছাড়া হুকুমের মালিক কে ? এমন কাণ্ড, না এসে উপায় ছিল না। দেরি হলে আপনিই তখন কৈফিয়ত তলব করে বসতেন।

দৃষ্টির ঝাঁজ সঙ্গে সঙ্গে কোমল হয়ে গেল। বড় খুশি ইন্দ্রজিত। লোকজন কেউ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না। রায়বাড়ির পোষা বিড়ালটার যে খাতির, সেটুকুও তার নয়। কিন্তু রাশভারি মানুষ দাদা উপস্থিত থাকতে কাউকে কিছু বলতে পারে না। বলবে কি—এদিকে এতবড় পালোয়ান মানুষ, কিন্তু ঘাড় তুলে বড়ভাইয়ের মুখোমুখি তাকাবার তাগত নেই।

গায়ের উপর কয়েকটা প্রচণ্ড থাবড়া মেরে ধুলোমাটি ঝেড়ে ফেলে ইন্দ্রজিত কতক পরিমাণে ভদ্র হয়ে দাঁড়াল। কর্তৃত্বের সুরে বলে, হুঁ, কি হয়েছে ?

বিনয় মনে মনে চমৎকৃত হয়ে গেছে। এমন কায়দার কথা মুখে আসে, আগে কে জানত! বাঁশির বিপদ, কথা তাই আপনা-আপনি ঠোঁটে এগিয়ে আসে। কথার গুণে হিংস্র বাঘ বশ হয়ে গেল।

সাহস পেয়ে তখন সে আরও কিছু ভূমিকা করে নেয়ঃ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবু। ম্যানেজার পুলিনবাবু বলতে গেলে উপরওয়ালা আমার—তাঁরই সম্বন্ধে বলা। কিন্তু আপনাদের বাগান দেখাশোনার ভার আমার উপর দিয়েছেন। সেই বাগানের মধ্যে এতবড় ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। হয়ে গেলে তখন যে আমার মুখ দেখবার উপায় থাকবে না। অসময়ে তাই আসতে হল। নইলে আমার উপরেই দোষ পড়ত, জেনেশুনে আমি গোপন করে গিয়েছি। আপনি আমায় খুন করে ফেলতেন।

ইন্দ্রজিত অধীর কণ্ঠে বলে, কি করেছে পুলিন-দা, তাই বল।

বাগানে রিফিউজি ঢুকে পড়েছে। তাদের তাড়াবার জন্য বড়বাবু ম্যানেজারকে বলে গেছেন।

জানি—

দাদার উপরে ইন্দ্রজিতের কিছু অভিমান আছে, সে যে পদ্ধতি বাতলেছিল সেটা না নিয়ে পুলিনের উপরে ভার দিয়ে গেলেন। বলে, তাড়াচ্ছে না বুঝি ম্যানেজার—ঘুষ খেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে? সে আমি জানতাম।

ঘুষ নয়। বিয়ে করে ফেলছেন রিফিউজিদের একটা মেয়ে। জামাই হচ্ছেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে ইন্দ্রজিত বলে, সেই তো বড় ঘুষ। টাকাপয়সা কোথায় পাবে রিফিউজিরা? তাই মেয়ে ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ পেয়ে জামাই গণ্ডগোল চাপা দিয়ে দেবে। মনের সুখে ঘরবসত করবে ওরা। মানুষ চেনেন না দাদা, দুটো 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' শুনেই গলে যান। এই ঘুষখোরটার উপর সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন।

গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ, অধিক ভাবনাচিন্তার ধার ধারে না, যা করবার লহমার মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ল্যাঙট ছেড়ে ধুতিটা কোন

পতিকে জড়িয়ে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে দ্রুতপায়ে ইন্দ্রজিত বাড়ি ছুটল। সোজা অফিসঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, ম্যানেজার কোথা গেল—পুলিন-দা ?

দরোয়ান অবাক হয়ে গেছে এই কাগজপত্র ও হিসাবকিতাবের ঘরে ছোটবাবুর আবির্ভাব দেখে। কোনদিন ইন্দ্রজিত এমুখো হয় না। এত সকালে তিনি তো আসেন না—

যেখানে থাকে, ডেকে নিয়ে এস। এক্ষুনি—এই দণ্ডে।

বিনয় ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। এই ব্যাপারে তার কোন হাত আছে, গোপন থাকা ভাল। ইন্দ্রজিত অধৈর্য হয়ে রোয়াকে এসে এগিয়ে দাঁড়ায়। পুলিনকে দেখে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বিয়ে করছ নাকি তুমি ?

পুলিন তার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে বলল, ভিতরে গিয়ে বসি চলুন।

ঘরে ঢুকে ইন্দ্রজিত বলে, শুনতে পেলাম, তোমার বিয়ে হচ্ছে পুলিন-দা।

পুলিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, ঠিকই শুনেছেন।

রিফিউজিদের এক মেয়ে ?

পুলিন বলে, পাকেচক্রে আজকে সেইরকম দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু রাজবাড়ির মেয়ে।

ইন্দ্রজিত বলে, রাজা তো এখন পথেঘাটে। দেখেশুনে সামাল হয়ে পা ফেলতে হয়, কখন কোন রাজাকে মাড়িয়ে ফেলি।

একথার কী জবাব দেবে পুলিন।

ইন্দ্রজিত বলে চলেছে : তুমি শুধুমাত্র কর্মচারী নও, আত্মীয়-সম্পর্ক তোমার সঙ্গে, দাদা বলে ডাকি। অচেনা মানুষ তারা, দেশভুঁই কুলশীল কিছুই জানা নেই—বিয়ে অমনি করলেই হল। বিয়ের ইচ্ছে হয়ে থাকে তো মেয়ের কিছু অভাব আছে ? ক-ডজন চাই

মেয়ে? বিশে বোদে জানকী ওদের বলে দিচ্ছি। ভাল ভাল ঘর থেকে মেয়ের খোঁজ এনে দেবে।

পুলিন বলে, অশ্বিনীবাবু বাজে লোক নন। আমাদের স্বজাতিও বটেন। ওঁদের অঞ্চলের মধ্যে সবাই একডাকে চেনে। ভাল রকম খবরাখবর নিয়ে তবে এগিয়েছি।

ইন্দ্রজিত রায় দিয়ে দেয়: হবে না বিয়ে। জবরদস্তি করে বুকের উপর চেপে বসেছে, বুকে বসে দাড়ি ছিঁড়ছে। আমাদের মহাশত্রু—তাদের সঙ্গে তোমার ভাবসাব। আশ্চর্য!

এবার কিছু চটে গিয়ে পুলিন বলে, ভাব জমাতে হয় দায়ে পড়ে। দাদার হুকুম যে তাই। আপনি তো উপস্থিত ছিলেন সেই সময়। দাদা বললেন, মামলামোকদ্দমার কারণ না ঘটে, সব দিকে গোলমাল বাধিয়ে পেরে উঠব না, মিষ্টি-কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে সরিয়ে দাও। দাদা না বললে এত বাজে সময় আমার নেই যে একঘণ্টা দু-ঘণ্টা বাগানে বসে মশার কামড় খাই। এমন টানাপোড়েন করতে দেখেছেন আগে কখনো?

ইন্দ্রজিত বলে, ভাব জমিয়ে জমিয়ে তাই বলে বিয়ে করে বসবে?

দায়ে পড়ে। নইলে কিছুতে ওঁরা সরবেন না, ধনুক-ভাঙা পণ ধরে আছেন। অশ্বিনীবাবু কথা দিয়েছেন, মেয়ের বিয়ে যে দিন হয়ে যাবে, ঠিক তার পরের দিন যেখানকার মানুষ সেইখানে দলসুদ্ধ ফেরত চলে যাবেন। পাকিস্তানে সবই আছে—মেয়ের উপযুক্ত বরপাত্তর নেই। কাজকর্ম ছেড়ে আমি এখন কোথায় ওদের জন্ত হুড্ড-হুড্ড করে পাত্র খুঁজে বেড়াই! শেষটা তাই বলতে হল, ফেলুন কিনে টোপর, মাথায় চাপিয়ে বরাসনে বসে পড়ি।

ইন্দ্রজিতের রাগ চলে গিয়ে পুলিনের উপর সমবেদনা জাগছে। মনিবের ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বেচারি এই কাজ করতে যাচ্ছে। কথা দাঁড়াচ্ছে রিফিউজি তাড়ানো নিয়ে। দাদা যখন

উপস্থিত নেই, কর্তা ইন্দ্রজিত। নিজের মতলব খাটিয়ে দেখবে সে এই সুযোগে।

ইন্দ্রজিত বলে, পাত্র খুঁজতে হবে না তোমায়, বরাসনেও বসতে হবে না। দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছি পুলিন-দা। কোনদিন আর বাগানমুখো যেন যেতে দেখিনে, আমার এই শেষ কথা। আমি ভার নিলাম—যা করবার, আমিই করব। কি করব তা-ও বলি। তোমাদের ঐ প্যানপেনে পলিসি আমার নয়। একদিন গিয়ে—একদিন কেন, আজ বিকালেই—টুঁটি ধরে ঐ ক'টাকে রেলরাস্তার ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে আসব। ব্যস, খতম!

পুলিন সভয়ে বলে, কী সর্ব্বনাশ! ফৌজদারি জুড়ে দেবে ওরা কোর্টে গিয়ে। দাদা পই-পই করে মানা করে গেছেন। বাঙাল মানুষ—জানেন না ওদের, যেমন ত্যাঁদোড় তেমনি মামলাবাজ।

ইন্দ্রজিত অধীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, কোর্টে যাবার তাগত থাকতে ছেড়ে আসব নাকি? যায় তো হাসপাতালে যাবে, অন্য কোথাও নয়। তুমি চুপচাপ খাতাপত্তর লেখগে বসে। তোমায় এসব ভাবতে হবে না।

যেমন কথা, সেই কাজ। বিকালবেলা ইন্দ্রজিত জীপ হাঁকিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল। জীপ ভরতি বাছা বাছা চার সাগরেদ—জানকী বিশে বোদে ও অশোক। আরও জন দশেক আখড়ায় মজুত করে রেখে এসেছে: দরকার পড়লে জীপ পাঠিয়ে দেব। সে দরকার পড়বে না জানি। আমাদের পাঁচ জনকে খতম করে তবে তো! তবু তৈরি থেকো তোমরা।

ইন্দ্রজিত এমনি খাসা মানুষ, কিন্তু রাগলে কোন-কিছুতে পিছপাও নয়। সেই মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এল—তারপর থেকে বিনয়ের সোয়াস্তি নেই। কী কাণ্ড ঘটে না জানি! ক্ষণে ক্ষণে বাগানের ফটকে এসে দেখে। ফিরে এসে আদ্যোপান্ত বাঁশিকে

বলেছে। বলে, ভাল করলাম কি মন্দ করলাম কে জানে। হাতে মাথা-কাটা মানুষ—কখন এসে পড়ে দেখ। খাতির-টাতির কোরো। যেমন রঞ্জিত রায় তেমনি ইন্দ্রজিত রায়—বাগানবাড়ির মালিক দু-জনেই ওঁরা।

এসে পড়ল এতক্ষণে। একরশি দূর থেকেই হাঁক পাড়ছে: অশ্বিনী বাবু কে আছেন মশায়? বাইরে চলে আসুন। বেরিয়ে বারাণ্ডায় আসুন এক্ষুনি।

তড়াক করে লাফিয়ে নামল জীপ থেকে। অশ্বিনী হন্তদন্ত হয়ে আসেন। এসে হাতজোড় করে দাঁড়ান: আসতে আজ্ঞা হোক ছোটবাবু। আজ আপনার পায়ের ধূলো পড়তে পারে—বাঁশি তাই বলছিল। ওরে বাঁশি, চেয়ার বের করে দে। প্যাণ্টলুন-পরা ছোটবাবু মাদুরে বসতে পারবেন না।

ইন্দ্রজিত ভ্রূকুটি করে বলে, চেয়ার লাগবে না। বসবার জন্য আসি নি। কিন্তু বাঁশিটা কে শুনি? আমি আসব, সে লোক টের পায় কেমন করে?

অশ্বিনী বলেন, আমার মেয়ে বাঁশি। মেয়ে নয়, গলার কাঁটা। গিলতে পারিনে, উগরে ফেলতেও পারিনে। মেয়ের দায়ে পড়েই আপনাদের জায়গার উপর আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ইন্দ্রজিত গর্জন করে ওঠে: জায়গা ছেড়ে মান থাকতে থাকতে আপসে চলে যাবেন কিনা জানতে চাই।

সদাশিব এসে পড়েছেন। সকাতরে তিনি বলেন, সে কী কথা! আপসে নয় তো কি হাঙ্গামা করতে যাব? সে মানুষ আমরা নই বাবা। সাতপুরুষের ভিটেমাটি গাঁ-গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি। কিসের জোরে তোমাদের হকের বাগান আঁকড়ে থাকতে যাব? জায়গা দেখাদেখি হচ্ছে। কোনরকমে মাথা গুঁজবার মতন জায়গা পেলেই চলে যাই।

ইন্দ্রজিত মাটিতে জুতো ঠুকে বলে, ওয়াদার ধার ধারিনে মশায়।

আজকে—এক্ষুনি যেতে হবে। না যাবেন তো অষুধ আছে। সে অষুধ যৎসামান্ত সঙ্গে আছে, বাকি সব আখড়ায় রেখে এসেছি।

বলে সে জীপের চার জনকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

অশ্বিনী নির্বিকার শান্ত কণ্ঠে মেয়েকে ডেকে বললেন, ওরে বাঁশি, ছেলেরা সব এসেছেন। পাঁচ জন। তাড়াতাড়ি পাঁচ কাপ চা করে দে মা। অতগুলো কাপ নেই তো আমাদের—নীরেনের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়।

ইতিমধ্যে হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা টানতে টানতে বারান্দায় এনে দিয়ে বাঁশি সামনের মাঠটুকু পার হয়ে নীরেনের বাড়ির দিকে গেল। ইন্দ্রজিত দেখছে তাকিয়ে, জীপের ছোঁড়ারাও দেখল। দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রজিত, আস্তে আস্তে বসে পড়ল চেয়ারে। বলে, আজকে যাওয়ার নিতান্তই যদি অসুবিধা থাকে—বলে দিন কবে যাচ্ছেন। খুব বেশি তো এক হপ্তা, তার উপরে কিছুতে নয়। যেতেই হবে, থাকা চলবে না। পাকা-কথা শুনে নিয়ে তবে নড়ব। মিউমিউ-করা মেনি-মুখো পুলিন-দা পান নি আমায়—

অশ্বিনী বলেন, ঐ যে চেয়ার দিয়ে গেল—আমার মেয়ে বাঁশি। পাকা-কথাই দিচ্ছি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে তারপরে একটা মিনিটও আর থাকব না। হিন্দুস্থানেই থাকব না। কলকাতার ঘুরে দণ্ডবৎ রে বাবা—নিজের জায়গায় যাব। কিন্তু সোমত্ত মেয়ে কাঁধে নিয়ে ফিরে যাই কেমন করে? যাওয়া কি উচিত, আপনিই বলুন বিবেচনা করে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইন্দ্রজিত বোধ করি বিবেচনাই করছে মনে মনে। পুলিন-ঘটিত ব্যাপারটা এঁদের মুখ থেকেই শুনে নিতে চায়। বলে, এল সম্বন্ধ কিছু?

পুলকিত স্বরে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছে একটা। বয়স কম, অত্যন্ত সৎ ছেলে, বি. এ. পাশ। বাইরের কেউ নয়, আপনাদের [illegible] পুলিনবিহারী। যার নাম করে ঐ বলছিলেন।

ইন্দ্রজিত খিঁচিয়ে ওঠে: বি. এ. পাশ বলে কপালে ছুটো শিং উঠেছে নাকি? পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, খবর রাখেন না। করপোরেশনে মেথর-ঝাড়ুদার চেয়েছিল—এক-শ বি. এ.-র দরখাস্ত পড়ে গেল সেই চাকরির জন্য।

অশ্বিনী বলেন, কিন্তু আমাদের পুলিনবিহারীর চাকরি তো ভালই। দেড়-শ টাকা করে দেন আপনারা। তার উপরে আপনাদের নেকনজরে আছে, আত্মীয়সম্পর্ক রয়েছে। ধাঁ-ধাঁ করে অনেক উন্নতি হবে, কি বলেন?

সে যখন হয়, তখন হবে। মাইনে দেড়-শ কি কত, তা-ও সঠিক বলতে পারব না। দাদা জানেন। দেড়-শ টাকাই ধরে নিচ্ছি—একলা একটা মানুষেরই তো ওতে কুলায় না। এই ধরুন, তিরিশ দিনে সের ত্রিশেক মাংস—তাতেই লেগে গেল নব্বুইয়ের উপর। কত বাকি রইল হিসেব করে দেখুন এবার। দেড়-শ টাকা পায়, সেই মানুষের আবার বিয়ে করে পরের মেয়ে ঘরের আনার শখ! ছি-ছি!

অশ্বিনী যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন: সর্বনাশ, অত শত ভেবে দেখিনি তো! দেড়-শ টাকায় একজনেরই চলে না, ছু-ছুটো মানুষের কেমন করে চলবে! বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে এসে মাথায় আর কিছু নেই ছোটবাবু। আগুপিছু ভেবে দেখিনে। ঠিক বলেছেন, না খেয়ে মরবে আমার বাঁশি। কী মেয়ে দেখলেন তো চোখে। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে জাঁক করে কিছু বলব না—

কথা শেষ হতে না দিয়ে ইন্দ্রজিত বলল, পুলিন-দা'র সঙ্গে আপনারা বিয়ে দিতে চাইলেও আমি দিতে দেব না। মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেওয়া। স্পষ্ট কথার মানুষ আমি, ঢাক-গুড়গুড় নেই। মানা না শুনলে অষুধ প্রয়োগ হবে।

জীপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, যে অষুধের সামান্য কিছু ঐ দেখতে পাচ্ছেন।

এমনি সময় বাঁশি থালার উপর পাঁচ কাপ চা সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরুল। জীপের চারজনকে দিয়ে বারান্দায় উঠে শেষ কাপ ইন্দ্রজিতের হাতে দিল। দিয়েই দালানে ঢুকে যাচ্ছিল, অশ্বিনী মেয়ের পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, একটুখানি দাঁড়িয়ে যা মা। ছোটবাবু, এই আমার বাঁশি। দেখুন, চেয়ে দেখুন। বাপ বলে মেয়ের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলিনে—

সদাশিব সগর্বে বলেন, আমার ছাত্রী—আমার কাছে পড়ে পাশ করল। কিন্তু আমিই বা কতটুকু পড়ালাম, মেয়েই বা ক'দিন পড়ল! পরীক্ষায় বসে কী সব লিখে এল, পাশ হয়ে গেল ফার্স্ট-ডিভিসানে। একটু যদি পড়ত, স্কলারশিপ পেয়ে যেত। তিরিশ বছরের মাস্টারির মধ্যে এমন বুদ্ধিমতী আমি দেখিনি বাবা। ডাকি আমি কাঞ্চনবরণী বলে—

বাঁশির একখানা হাত তুলে ধরে বলেন, তপ্ত কাঞ্চনের আভা! নামটা সেকেলে, কিন্তু এর চেয়ে মানানসই নাম আমার মনে আসে না। রাজবাড়ির মেয়ে, রাজপুত্তুর ছাড়া এ কন্যা মানায় না। মেজরাজাকে তাই বলি, পুলিনের মতন পাত্রের হাতে কেন দিতে যাবে? থাকুক মেয়ে ঘরে, যেদিন ভাল বর জুটবে বিয়েথাওয়া সেইদিন। আজকে তুমিও আমার মতে মত দিলে বাবা।

অশ্বিনী বললেন, শিব-দাদা বলেন বটে, কিন্তু আমি তেমন আমল দিইনে। ভাল বর পাচ্ছি কোথা পুলিনবিহারীর চেয়ে? আপনার কথায় আজকে ভয় ধরে গেল ছোটবাবু। এতখানি কখনো তলিয়ে দেখিনি। ভাবনার কথাই বটে। শিব-দাদার কাঞ্চনবরণী যার তার হাতে পড়ে অন্নাভাবে উপোস করে না মরে।

বাঁশি ইতিমধ্যে চলে গেছে কখন। ইন্দ্রজিত জীপের দিকে হাঁক দিয়ে বলে, ড্রাইভার, বাবুদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে তুমি চলে এস আবার। আমি রইলাম, একটু কথাবার্তা বলে যাই। ফিরে এসে ফটকের সামনে রাস্তার উপরে থেকো, গাড়ি ভিতরে আনবার

দরকার নেই। আখড়ায় অমনি একটা খবর দিয়ে এস, যে যার বাড়ি চলে যাক।

মাছুর পেতে সদাশিব ও অশ্বিনী বারান্দায় বসে পড়লেন। ইন্দ্রজিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়: বা-রে, আমি এমন কাঠ-কাঠ হয়ে থাকতে গেলাম কেন!

প্যান্টলুন গুটিয়ে পা ছড়িয়ে সে-ও বসে পড়ল মাছুরে।

কথাবার্তা হল অনেক। বিবেচনা করে ইন্দ্রজিতও সায় দেয়। মেয়ের বিয়ে না দিয়ে দেশেঘরে ফেরত যাওয়া উচিত হবে না। বিপদ কখন কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ বলতে পারে না। এটা তবু শহর জায়গা—দরকার মতন সব রকম ব্যবস্থা হতে পারে। তার উপরে ইন্দ্রজিত সহায় রইল আখড়ার দলবল নিয়ে, ছুনিয়া যারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

রাত্রি প্রহরখানেক হতে অবশেষে ইন্দ্রজিত উঠে দাঁড়ায়। অশ্বিনী শুষ্কমুখে বলেন, কী যে করব ছোটবাবু, চোখে আমি অন্ধকার দেখছি। বাগান ছেড়ে যাবার জন্য আপনারা তাড়া দিচ্ছেন। অন্যের জায়গা জুড়ে রয়েছি—অন্যায় আমাদের ষোলআনার উপর আঠারআনা। বুঝি সমস্ত, কিন্তু কূলকিনারা দেখিনে। ঐ পুলিনবিহারী ছাড়া অন্য সম্বন্ধ একটাও এল না। অথচ আপনি মানা করছেন—

ইন্দ্রজিত উত্তেজিত ভাবে বলে, তার চেয়ে মেয়েকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান। পুলিন-দার মতো পাত্রের চেয়ে সে অনেক ভাল। বাগান ছাড়তে বলছি বলে যে এক্ষুনি ছুটে পালাতে হবে, তার কোন মানে আছে? দাদার আসতে এখনো বিশ-পঁচিশ দিন—ততদিন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। তার মধ্যে ভাবনাচিন্তা করুন, কোন ভাল পাত্র মনে আসে কিনা। আমিও ভাবি।

ভাবনাচিন্তা ইন্দ্রজিত অনেক করল, ভাবনার চোটে সে রাত্রি লহমার তরে দু-চোখ এক করতে পারেনি। ভোরে উঠে কুস্তি ও ডনবৈঠক করে—করতেও গিয়েছিল তাই। কিন্তু স্ফূর্তি লাগে না। ধ্বক করে সমাধান একটা মনে এসে যায়। এবং যেইমাত্র মনে আসা—তিলার্ধ দেরি নয়, আখড়া থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে জামা-কাপড় পরেই রওনা। জীপ এখন নেই, জীপের পরোয়াও সে করে না—খানিক পথ বাসে চড়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে বাগানে এসে উপস্থিত। ডাকাডাকিতে অশ্বিনী আর সদাশিব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম অশ্বিনীবাবু—উহু, নাম ধরা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না এখন। কি বলেন মাস্টারমশায় ?

॥ ষোল ॥

সকলে খুশি। ভাগ্য করে এসেছে বটে বাঁশি। এবং আরও ভাগ্য, দেশ ভাগাভাগি হয়ে হুল্লোড় বেধে গেল। সোনাটিকারি ছেড়ে সেই জন্যে আসা গিয়েছে। নয় তো কলকাতার এমন ঘর-বর স্বপ্নেও ভাবা যেত না।

কেবল সদাশিব চিন্তান্বিত। তিনি মাথা নাড়ছেন: কাঞ্চনবরণী আর ছোটটি নয়। তার মতটা জিজ্ঞাসা কর হে তোমরা।

অশ্বিনী বলেন, লাখ টাকা খরচ করে এমন পাত্র মেলে না। এর মধ্যে জিজ্ঞাসার কি আছে ? বড়লোক ওরা—কিন্তু সেটা কতখানি আন্দাজ করতে পার ? বিনয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সব খবর নিয়েছি। পাঁচ-পাঁচটা কলিয়ারি, বোন-মিল, কাঠের আড়ত, কলকাতার উপর বাড়ি চারখানা, মধুপুরে বাড়ি। আর এই শখের বাগানবাড়ি, যেখানটা উঠেছি আমরা। চার হাত এখন এক করতে পারলে হয় ওর বড়ভাই সেই পাজিটা এসে পড়বার আগে।

কিন্তু সদাশিব নিরস্ত হন না। বিরজাকে বলেন, তা হোক দিদি,

তুমি একটিবার জিজ্ঞাসা কর। মেয়েরা মেয়েদের কাছে মন খুলে বলে। আশিসও জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারে, পিঠোপিঠি ভাই-বোন ওরা। আশিসকে হয়তো সব বলবে।

বিরজার জিজ্ঞাসার আগেই বাঁশি নিজে থেকে বলছে, এত শক্তি আমার কে জানত পিসিমা? রাজবাড়ির দেয়ালে আটক রেখেছিলে, এক-পা পাড়ায় বেরিয়েছি তো রে-রে করে উঠতে। পার যদি তো আরও দুটো-চারটে মাস টালবাহানা কর। খবর ছড়িয়ে গেলে কোন দিন দেখবে রাজভবন থেকে খোদ গভর্নর এসে তোমাদের বারান্দায় মাদুরে চেপে বসেছেন।

আশিস এসে বলে, ভেবে দেখেছিস ভাল করে? তোর নিজের কি মত?

বিয়ের এসব কথা ভাবছিনে তো দাদা, ভাবছি কেবলই নিজের কথা। হাসতে হাসতে বলছিল বাঁশি, কণ্ঠস্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলতে লাগল, নিজের উপর ঘেন্না হয়ে যাচ্ছে দাদা। ঘেন্না এই গায়ের কটা চামড়ার উপর, মাস্টারমশায় যার জন্য কাঞ্চনবরণী বলে অত ব্যাখ্যান করেন। আমি মরে গেলে, ধর, মাঠের মধ্যে মড়া ফেলে দিয়ে এলে। শকুন এসে পড়বে, কাক আসবে, শিয়াল আসবে। জ্যান্ত থাকতেও যে তাই। শিয়ালদা স্টেশনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতে বললেন পিসিমা। হাতখানেক ঘোমটা টেনে ছিলাম সেই ক'দিন—ভালই হল, নয় তো বরে বরে দাঙ্গা বেধে যেত। সেই জন্যে বলি দাদা, তাড়াহুড়ো নয়, আরও কিছু দিন খেলিয়ে দেখ। কত উঁচুতলার বর আসতে পারে, সেটা এখন তোমাদের ধারণায় আসছে না।

এবং তারপরে বাঁশি কাঁদো-কাঁদো হয়ে নিজেই বিনয়ের কাছে গিয়ে পড়ল: সর্বনাশ, বিনয়-দা! চোর তাড়িয়ে ডাকাত পত্তন করলে, বিড়াল তাড়িয়ে বাঘ। তোমার ছোটবাবুর এক তিল আর দেরি

সইছে না। বলে, মাসের এই ক'টা দিনের মধ্যে বিয়ের কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে। বলে, আর পালোয়ান বর আস্তিন তুলে মাসল দেখায়।

বিনয় বলে, রাজবাড়ির মেয়ে, বড়লোকের বাড়ি ছাড়া মানাবে কেন তোমায় ?

নিশ্বাস ফেলে বলে, ভালই হবে। বাগানবাড়িটা তোমার এত পছন্দ—বিয়ের পরে তুমিই আটআনা হিস্যার আইনসঙ্গত মালিক হয়ে বসবে। আমার চাকরিটুকু দয়া করে বজায় রাখ তো থাকবে, নয় তো বাবার মতোই চলে যাব কোন এক দিকে।

বাঁশি সভয়ে বলে, রক্ষে কর। ঐ বরের বউ হয়ে আমি বাগানের মালিক হতে চাইনে। বাবা আর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল—যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে। বুকের মধ্যে গুরগুর করছিল আমার।

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলে। বলে, তোমার কাছে আমার লজ্জা করে না বিনয়-দা। বিয়ে করে যখন ভালবাসার কথা বলবে—মানুষজন ছুটে এসে পড়বে, দাঙ্গা বেধেছে বুঝি ! ভালবেসে একখানা হাত যদি ধরে তো গেছি আমি, মটমট করে হাড় চুরমার হয়ে যাবে।

বিনয় বলে, এ তো বড় ফ্যাসাদ। এমন বর, তা-ও তোমার পছন্দ নয়। তবে কি আকাশের চাঁদ নেমে এসে পিঁড়ির উপর দাঁড়াবে ?

চাঁদ আরও বেশি অপছন্দ। নাক নেই, চোখ নেই, গোলাকার থালার মতন সেই বর নিয়ে আমি কি করব ! পছন্দের বরের কথা বলব তোমায় একদিন ভেবেচিন্তে। এই বীর হনুমানটিকে তাড়াও দিকি এখন।

বিনয় বলে, সেই তো মুশকিল ! দুনিয়ার মধ্যে এক বড়বাবু আছেন, তিনিই শুধু ছোটভাইকে শামলাতে পারেন। ঐ যে

অত হম্বিতম্বি দেখলে, বড়বাবুর সামনে একেবারে কেঁচো। এ মাসটা বড়বাবু কলকাতার বাইরে, এই ফাঁকে বিয়ের কাজ কিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। একবার হয়ে গেলে তারপরে আর রদ হবে না তো। বড়বাবু এসে যত রাগই করুন, ভাইয়ের বউকে ফেলে দিতে পারবেন না। সেইটে ভাবছে।

বাঁশি বলে, কিন্তু আমি ভাবছি, এই লোক তোমার রোগাপটকা পুলিনবিহারী নয়। তুমি শত্রুতা করছ কোন গতিকে টের পেলে হাড়গোড় চুরমার করে দেবে একেবারে।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলে, কাজ নেই বিনয়-দা, তোমায় কিছু করতে হবে না। বাড়িসুদ্ধ সকলে খুশি, আমিই বা কেন খুশি হতে পারব না? ইচ্ছের বর ক-জনের ভাগ্যে ঘটে বল।

এমনি সমস্ত বলে বাঁশি চলে গেল। কপালে যা-ই থাক, এত কথার পরেও বিনয় চুপচাপ থাকে কেমন করে? খানিকটা ভেবে-চিন্তে সে ভবানীপুর রায়বাড়ি চলে গেল।

চুপিচুপি পুলিনকে শুভসংবাদ জানিয়ে দেয়ঃ ছোটবাবুর যে বিয়ে! শোনেন নি ম্যানেজারবাবু? বাগানবাড়ি ধুমধাড়াক্কা পড়ে গেছে। মা-বাপ নেই, মাথার উপরে শুধু এক বড়ভাই। বিয়ের সময়টা তাঁর নিশ্চয় থাকা উচিত। আপনি কি বলেন?

পুলিন স্তম্ভিত হয়ে তাকায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। তারও ঠিক সেই মত। বলে, নয় তো পরে এসে দুঃখ করবেন দাদা। আমার উপরে দোষ পড়বে। বলবেন, ভাই না হয় লজ্জায় লিখতে পারে নি, তুমি তো ছিলে। তুমি কি জন্যে খবরটা দিলে না?

বিনয় বলে, সন্দেহ করবেন, আমরা সবাই আছি চক্রান্তের মধ্যে। আমি ঐ বাগানবাড়ি পড়ে থাকি, আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। বড়বাবুকে তা হলে একটা চিঠি দিন ম্যানেজারবাবু।

পুলিন বলে, চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। ভাল হয়েছে, আজকে দাদা পাটনায় আছেন অন্য একটা মামলায়। এক্সপ্রেস-টেলিগ্রাম করলে দুপুর নাগাত হাতে পৌঁছে যাবে।

টেলিগ্রাম পেয়ে রঞ্জিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে যেন। এই কখনো হতে পারে—এত দূর সাহস ইন্দ্রজিতের কেমন করে হয়! একটি মাত্র ভাই—তার বিয়ের কত ঝাঁকজমক হবে ভেবে রেখেছেন। কিন্তু বিয়ের নামেই ইন্দ্রজিত তেরিয়া হয়ে ওঠে। ব্যবসা ও বিষয়আশয়ের ঝঞ্ঝাট একটার পর একটা এসে পড়ছে—তেমন জোর করে তাই লাগতে পারছেন না। এতদিনে হঠাৎ যদি সুমতি হয়ে থাকে, কত কত উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে—সর্বস্ব ফেলে-আসা নিঃস্ব লোকের জামাই হতে যাবে সে কোন দুঃখে!
মামলা ছিল পরের দিন, বিস্তর কষ্টে সেটা সোমবারে নিয়ে ফেলা গেল। রঞ্জিত কলকাতা ছুটলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির দরজায় পা দিয়েই—ইন্দ্রজিত কোথা?
ইন্দ্রজিতকে ডেকে আনতে বুড়ো দারোয়ানকে পাঠালেন।
বিয়ে হচ্ছে তোমার, খবর পেলাম।
খবর দিল কে দাদা?
প্রশ্নটা হুঙ্কারের মতো শোনায়। দৃষ্টি ইন্দ্রজিতের তবু ভাইদের দিকে নয়, মেজের দিকে নামানো।
রঞ্জিত জবাব দিলেন, খবর সত্যি হলে দেওয়াটা কিছু দোষের নয়। সত্যি কি মিথ্যে, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি।
ইন্দ্রজিত বলে, সত্যি—
আমার ভাইদের বিয়ের সম্বন্ধ আমি করলাম না, জানতেই পারিনে কিছু—বিয়ের মাতব্বরটা কে, জিজ্ঞাসা করি?
ইন্দ্রজিত চুপ করে থাকে।

নাম বল, কে ঘটকালি করছে? পাটনায় এই নতুন জুতো কিনেছি—দুটো পাটিই তার পিঠে ছিঁড়ব। বল, কে?

ইন্দ্রজিত জড়িত কণ্ঠে বলে, এর মধ্যে ঘটক কেউ নেই দাদা। পুলিন-দা পেরে উঠছে না বলে দলবল নিয়ে আমি বাগানে চলে গেলাম। সমস্ত রিফিউজি একেবারে উচ্ছেদ করে আসব—

তার বদলে বিয়ে সাব্যস্ত করে এলে ওদের মেয়ের সঙ্গে?

কী করব। অশ্বিনীবাবু কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কিছুতে নড়বেন না। ধরাধরি করতে লাগলেন—

ধরাধরি আরও লোকে করছে। আজ নয়, দু-বছর ধরে। একজন হলেন পাতিপুকুরের দে-সরকার মশায়। শুধুমাত্র হাতের ধরাধরি নয়—দেড়-শ ভরি সোনা, একসেট জড়োয়া, নগদ রূপেয়া আট হাজার—

ইন্দ্রজিত মরীয়া হয়ে বলে, আমি ওঁদের কথা দিয়ে ফেলেছি দাদা। দিনক্ষণও একরকম স্থির।

রঞ্জিত বলেন, কথা আমারও দেওয়া। আজ নয়, দু-বছর আগে। পাতিপুকুরদের বলা আছে, ভাই যদি কখনো বিয়েয় রাজি হয়, ওখানেই হবে।

ইন্দ্রজিত নিঃশব্দে হাতের গুলি ফুলিয়ে তুলছে।

রঞ্জিত আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন, জবাব দিতে হবে তোমায়, চুপ করে থাকলে হবে না। দুই জনে আমরা কথা দিয়ে বসে আছি—কার কথা থাকবে? তোমার, না তোমার বড়ভাইয়ের? বড় হয়েছ এখন, বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে, জবাবটা শুনে চলে যাই। কে কর্তা সংসারে—তুমি, না আমি? বিয়ের পাকা-কথা দেওয়া কার এক্তিয়ারে?

ইন্দ্রজিত মিনমিন করে বলে, আজ্ঞে, আপনার—

তাই যদি হয়, আমার হুকুম রইল বাগানমুখো কদাপি আর তুমি যাবে না। বোঝাপড়া যত-কিছু আমিই করব। পাকা শয়তান

দেখছি ঐ লোকটা যার নাম অশ্বিনী বললে। বিষম ঘড়েল। নিজে দলবল নিয়ে আমাদের বাগানবাড়ি বেদখল করে আছে—আবার মেয়ে ঠেলে দিচ্ছে, সেই মেয়ে আমাদের ভবানীপুরের বসতবাড়ির বউ হয়ে চেপে বসুক। ভেবেছিলাম, মিঠে কথাবার্তায় সরিয়ে দেব। যখন এত চালাকি, আসল মূর্তি ধরতে হল। আমার একটা মুখের কথা পেলে থানাসুদ্ধ হামলা দিয়ে পড়বে। হোক তবে তাই।

॥ সতের ॥

সমস্ত ব্যাপারটা পুলিন দরোয়ানের কাছে শুনেছে। ফিসফিস করে বিনয়কে বলে, দাদা নিজে এবারে নেমে পড়লেন। রক্ষে নেই, বিয়ে করতে হবে না আর ছোটবাবুকে। বাড়া-ভাতে ছাই পড়ে গেল।

বিনয়ের সঙ্গে পুলিনের আপাতত গলায় গলায় ভাব। পুলিন বলে, কত বলেকয়ে দাদাকে নরম করেছিলাম: সর্বস্ব খুইয়ে ভদ্রলোকেরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন, ওঁদের দিকটাও দেখতে হবে বই কি! একেবারে অকূল-পাথারে না পড়েন। তা দেখ, ঐ অশ্বিনীবাবুর মনে মনে বজ্জাতি। নয়তো ইন্দ্রজিতের সামনে খামোকা মেয়ে হাজির করবার দরকারটা কি ছিল? বুঝুন ঠেলা এইবারে। মেয়ের বিয়ে আর দিতে হবে না—ধুমসি মেয়ের হাত ধরে বাগান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। চোখের জলে পথ দেখতে পাবেন না তখন।

বিনয় হন্তদন্ত হয়ে এই খবর অশ্বিনীকে এনে দেয়: খোদ বড়বাবু চলে আসছেন—খুব সম্ভব পুলিস সঙ্গে নিয়ে। লালবাজার অবধি ওঁর খাতির। এস্পার-ওস্পার করে তবে যাবেন।

অশ্বিনীর চমক লাগে। আদ্যোপান্ত শুনে একটুখানি গুম হয়ে

রইলেন। তারপর হেসে ওঠেন: ভালই হল। পুরুষসিংহ মানুষটিকে চোখে দেখা যাবে।

কলরব করে তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে জড় করলেন: বিনয় খবর এনেছে, শোন সবাই। এসে অবধি রঞ্জিত রায়ের নাম শুনে আসছ, কলোনিতে বসেই সেই মানুষের দর্শন পাওয়া যাবে। হ্যাঁ বিনয়, আসবেন তো সত্যি সত্যি—না ভুয়ো খবর। কবে আসবেন, বলে দাও।

সদাশিবকে বলেন, অতবড় মানুষটা আসছেন। খাতিরযত্ন তো করতে হয়। কোথায় নিয়ে বসাই, কী খেতে দিই—

সদাশিব বলেন, আসছেন, ঐ তো বলছে, একলা একটি মানুষ নয়। পুলিস নিয়ে আসবেন। খাতিরযত্ন খাওয়ানো-বসানো অনেক জনকেই করতে হবে।

আশিস গর্জন করে উঠল: খাতিরযত্নের ভারটা আমার উপরেই থাকুক বাবা। আপনাদের বয়স হয়েছে, বাইরে বেরবেন না, ঘরের মধ্যে থাকবেন। দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকবেন। যেমন করলে মানানসই হয়, আমরাই সেটা করব।

আবার বলে, এ তো জানা কথা—এসে পড়বে একদিন ওরা। সব কলোনির ঐ এক ব্যাপার। ভালই হল, কয়েকটা দিন তবু হাতে পাওয়া গেছে। একবার শিকড় গেড়ে বসে গেছি, তাড়ায় কে দেখি।

অশ্বিনী কড়া হয়ে বলেন, তুমি গণ্ডগোল পাকাতে এস না এর মধ্যে। যা করবার আমি করব। মানা করে দিচ্ছি, একেবারে সামনেই আসবে না তুমি। খবরদার!

আশিস বলে, আসব না সামনে—তার জন্যে কী সামনে আসার কাজ তো নয়। পাড়ার মধ্যে ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে থাকব। সময় হলে রে-রে করে বেরিয়ে পড়ে টুটি ধরে সব ক'টাকে আছড়াব।

রাগে গর-গর করতে করতে আশিস বেরিয়ে গেল। অশ্বিনী

একবিন্দু বিচলিত নন। বিনয়কে বলেন, আগেভাগে খবরটা দিয়ে ভাল করলে বিনয়। বারান্দার উপর চৌকি এনে তোশক পেতে ফরাস করে রাখা যাবে, বড়বাবু তার উপর এসে বসবেন। এস দিকি ধরাধরি করে চৌকিটা নিয়ে আসি ঘরের ভিতর থেকে।

বিনয় বলে, আপনি কেন টানাটানি করতে যাবেন? আমি আনছি।

হঠাৎ বাঁশি এসে পড়ে। খিল-খিল করে হেসে বলে, অত বড় চৌকি একলা তুমি নিয়ে আসবে বিনয়-দা? দেখি, পার কেমন! তাই দেখতে এলাম।

বলে কোমরের দু-পাশে দু-হাত দিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়াল। বিনয় ঝগড়া করেঃ আমি একলা আনব, আর উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন! জেঠামশায়, বলে দিন, বাঁশি আর আমি দু-জনে ধরে এইখানে এনে চৌকি পাতি।

অভ্যর্থনার পরের অধ্যায় তখন অশ্বিনীর মাথায় ঘুরছে। বললেন, খেতে কি দেওয়া যাবে রে বাঁশি—সন্দেশ? দূরের দোকান, এখনই তা হলে ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঁশি প্রবীণা গিন্নির মতো বলে, কত জন সঙ্গে নিয়ে আসে ঠিক নেই। দরের সন্দেশ অতগুলো মুখে দিয়ে উঠতে পারব কেন? তার চেয়ে গোটা দুই ঝুনো-নারকেল এনে দাও বিনয়-দা। আর কিছু ক্ষীর। পিসিমা খাসা চন্দ্রপুলি বানিয়ে দেবেন। ঘরের তৈরি জিনিস—খেতে ভাল, খরচার দিক দিয়ে কম।

সদাশিব হেসে বলেন, চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ তো লোকে জামাইয়ের জলখাবারে দেয়। আসছে হাঙ্গামা করতে, কাঞ্চনবরণী তাদের চন্দ্রপুলি খাইয়ে পোষ মানাবে।

অশ্বিনীর এসব কানে যায় না, তিনি ভাবছেন তখন অন্য কথাঃ ওরে বাঁশি, গড়গড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে যে! আর কিছু অম্বুরি

তামাক। নীরেনের কাকা হরিদাসবাবু গড়গড়ায় তামাক খান, সেইটে চেয়ে আন। মেজেঘষে ঝকঝকে করে ফরাসের পাশে রেখে দিবি।

আগে পিছে জন দশেক পশ্চিমা-দরোয়ান এবং দুটো কনেস্টবল নিয়ে রঞ্জিত রায় হুড়দাড় করে বাগানবাড়ি ঢুকলেন। লড়াইয়ের সেনাপতি যেন। অশ্বিনী আর সদাশিব, দেখা গেল, এগিয়ে এসে ঝিলের পুলের উপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আসতে আজ্ঞা হোক বড়বাবু। দেশ ছেড়ে আপনার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছি। কত যে উপকৃত, মুখে বলা যায় না। এতদিনে যা-হোক একবার পদধূলি পড়ল।

পোকামাকড়ের দিকে যেমন তাকায়, রঞ্জিত তেমনি দৃষ্টিতে একনজর দেখে নিলেন। কানেই গেল না যেন কোন কথা। সদ্য-তৈরি পাড়াটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পিছন ফিরে দরোয়ানদের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলেন: ঘরের চাল-বেড়া লাঠি মেরে চুরমার করবে, হাঁড়িকুড়ি কাঁথামাদুর ঝিলের জলে ছুঁড়ে দেবে। উনুন ভাঙবে, মানুষ একটা একটা করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফটকের বাইরে নিয়ে ফেলবে।

অশ্বিনী হেসে বলেন: ঘাড় ধরতে দিলাম আর কি!

রঞ্জিত জ্বলে উঠলেন: দেবেন না, জোরজার করবেন? এই ক'টি লোকই সমস্ত নয়—ডেভিড সাহেবের জমিতে দেড়-শ লোক খাটছে, হাঁক দিলে তারা সব এসে পড়বে। আরও নানান ব্যবস্থা আছে। কাদের কত জোর, দেখা যাক।

অশ্বিনী হাসতে হাসতে বলেন, এই দেখুন বড়বাবু, আপনি উল্টো বুঝে নিলেন। গায়ের জোরে কি করে পারব, জোরের কথা বলছিনে। পালিয়ে যাব আমাদের ঘাড়ে হাত পড়বার আগে।

সদাশিব জুড়ে দিলেন: কাজটা আমাদের খুব রপ্ত হয়ে গেছে।

বোঁচকাবিড়ে কাঁধে ছেলেপুলের হাত ধরে রাতবিরেতে টুকটুক করে কেমন সব পালিয়ে বের হয়ে যাই। বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায় না।

হা-হা করে সদাশিবও হাসছেন। রঞ্জিত পাকাবাড়ির সামনে এসে গেছেন এতক্ষণে। বারান্দায় চৌকির উপর শতরঞ্চি তোশক ও ধবধবে চাদরে ফরাস বানানো। সেই দিকে হাত বাড়িয়ে অশ্বিনী বলেন, বসতে আজ্ঞা হয় বড়বাবু।

রঞ্জিত ঘাড় নাড়লেন : বসতে আসিনি। খাতিরে ভোলবার লোক আমি নই। গণ্ডগোলের ইচ্ছে না থাকে তো দলবল নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। এই মুহূর্তে—আমার চোখের উপর দিয়ে। আজ নয় কাল যাব, এসমস্ত শোনাশুনি নেই।

অশ্বিনী কাতর হয়ে বলেন, যেমন হুকুম, ঠিক তাই হবে। কিন্তু আমাদের কথাও একটু শুনুন। তার পরেও যদি বলেন—চলে যাব এখনই। আপনার জায়গাজমি, আপনার ঘরবাড়ি—আমাদের কিছুই নয়। বসে বসেই হোক না কথা। ওরে বাঁশি, কলকেটায় আগুন দিয়ে যা। আর চা-টা কি আছে তোদের, নিয়ে আয়।

যতই হোক, বয়স্ক ভদ্রলোক কথাটা বলছেন। ফরাসের উপর অঙ্গ একটু না ঠেকিয়ে পারা যায় না। বসতে বসতে রঞ্জিত বলেন, চা লাগবে না। কি বলতে চান, বলে ফেলুন। নষ্ট করার মতন সময় নেই।

কিন্তু বলছেন কাকে? দুটো মাদুর হাতে নিয়ে অশ্বিনী ইতিমধ্যে দরোয়ান-কনেস্টবলদের দিকে নেমে গেছেন। আমতলায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলছেন, এতখানি পথ এসেছ, ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নাও।

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিলেন। বলেন, বস বাপধনেরা, পা ছড়িয়ে আরাম করে বস। চা দিয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু ব্যস্ত হচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলিগে।

ফুঁ দিতে দিতে বাঁশি বেরিয়ে এসে গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে চলে গেল। ফরসা মুখ আগুনের আভায় গোলাপি দেখাচ্ছে। রঞ্জিত তাকিয়ে দেখলেন। আমতলা থেকে এসে অশ্বিনী বারান্দার উপর উবু হয়ে বসতে যাচ্ছেন—ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রঞ্জিত পাশের জায়গা দেখিয়ে দরাজ ভাবে বলেন, নিচে কেন, ফরাসের উপর উঠে বসুন।

জিভ কেটে অশ্বিনী বলেন, সে কী কথা, আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারি আমি!

কেন পারবেন না? আপনি কি মানুষ নন? সম্ভ্রান্ত লোক, না হয় অবস্থার ফেরে পড়েছেন। নিজেকে ছোট ভাবেন কি জন্য?

এর পরে অশ্বিনী বারান্দার উপর না বসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রঞ্জিত বলেন, কলকে দিয়ে গেল—ঐ বুঝি আপনার মেয়ে?

অশ্বিনী ঘাড় কাত করলেন।

মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যাবেন না এখান থেকে?

জোর করবার কিছু নেই হুজুর। আপনার জায়গা—যদি আপনি সদয় হয়ে আর কয়েকটা দিন মঞ্জুর করেন।

রঞ্জিত বিরক্ত হলেন: এমন আজ্ঞে-হুজুর করবার কি আছে বলুন তো? খালি পড়ে ছিল জায়গাটা, এসে উঠেছেন। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!

তারপর অতিশয় অন্তরঙ্গ সুরে বলেন, বিয়ের সম্বন্ধ আসে কিছু কিছু?

অশ্বিনী গদগদ হয়ে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার জায়গাটা বড় পয়মন্ত। একের পর এক আসছে। ঠিকঠাক প্রায় হয়ে গেছে, শুধু আপনার আশীর্বাদের অপেক্ষা।

রঞ্জিত ভ্রূকুটি করলেন: আমার ভাই ইন্দ্রজিতের কথা যদি ভেবে থাকেন, সে আশা ত্যাগ করুন।

রঞ্জিতের মন ভিজেছে, এমনি অনুমান হয়েছিল। হতভম্ব হয়ে অশ্বিনী তাকিয়ে পড়লেন : আজ্ঞে ?

আপনার এখানে আমার ছোটভাই কথা দিয়ে গেছে শুনলাম। তার কথার কানাকড়িও দাম নেই। আমি তার গার্জেন। পাতিপুকুরে ভাইয়ের বিয়ে দেব, অনেক আগে কথা দিয়ে বসে আছি।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। রঞ্জিত গড়গড়া টানছেন। মুখের নল সরিয়ে সহসা প্রশ্ন করেন, একের পর এক বলছিলেন—আর কোথায় সম্বন্ধ হল ?

অশ্বিনী বলেন, ইন্দ্রজিত বাবাজীর আগে আপনাদের ম্যানেজার পুলিনবিহারীর সঙ্গে কথা পাকা হয়েছিল।

রঞ্জিত ঘাড় নাড়লেন : সে-ও ছেড়ে দিন। আমি তার মনিব। মনিব শুধু নয়, তার অনেক উপরে। এইটুকু বয়স থেকে বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখানো চাকরি দেওয়া সমস্ত করেছি। ঝরিয়ার খনি নিয়ে গোটা কয়েক মামলা চলছে। ফয়শালা হয়ে গেলেই সমস্ত ভার দিয়ে তাকে সেখানে পাঠাব। বিয়ে যাওয়ার ঝঞ্ঝাটে পুলিন এখন যেতে পারবে না। যদি যায়, চাকরি খতম হবে। কোনরকম সম্পর্ক থাকবে না আমাদের সঙ্গে।

ফড়ফড় করে আবার কিছুক্ষণ গড়গড়া টেনে মুখ তুলে রঞ্জিত বলেন, অন্য কোথাও ?

আজ্ঞে না। আর তো দেখছিনে আপাতত। তবে সময় পেলে নিশ্চয় আরও জুটে যাবে।

হুঁ—বলে রঞ্জিত ভাবলেন একটুখানি : মেয়েটা কেমন ?

সহসা কথাবার্তা বন্ধ। বাঁশি এই সময়ে ফরাসের পাশে একখানা টুল পেতে রঞ্জিতের জন্য চা-জলখাবার আনল। সদাশিব খানিক আগে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কেটলি ও কতকগুলো গেলাস-কাপ হাতে বাঁশির পিছু পিছু বেরিয়ে আমতলার দিকে তিনি নেমে গেলেন।

ভাবছেন রঞ্জিত, আর এক এক চুমুক চা খাচ্ছেন। বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে বাঁশি আবার ঘরে ঢুকে গেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে রঞ্জিত পূর্বকথা শুরু করেন: কেমন মেয়ে, কিছু তো বললেন না।
অশ্বিনী বলেন, নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কি বলব? চা দিয়ে গেল, ঐ তো চোখেই দেখলেন হুজুর।
চোখে দেখার কথা নয়। বলি, রীতপ্রকৃতি কেমন? হিংসুটে-কুচুটে নয় তো? ঝগড়া করবে না, নাকে কাঁদবে না কথায় কথায়?
অশ্বিনী গড়গড় করে একরাশ পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। রঞ্জিত ধমক দিয়ে ওঠেন: হ্যাঁ কিম্বা না বলুন। সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনবার সময় নেই।
আজ্ঞে না, ওসব কিছুই করবে না।
রঞ্জিত বলেন, তবে শুনুন। দশ বছর আমার গৃহশূন্য। বিয়ে করিনি সৎমা এসে ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেবে বলে। এখন তারা বড় হয়ে উঠেছে। কোলের ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যায়। সে ছেলে নেবুতলায় আমার শাশুড়ির কাছে মানুষ হচ্ছে। মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে—বড়টি থার্ড-ইয়ার, ছোটটি ইণ্টারমিডিয়েট দেবে এবার। তাই ভাবছি, আপনার মেয়ের রীতপ্রকৃতি সত্যি সত্যি যদি ভাল হয়—এখন বিয়ে করলে বোধহয় দোষের হবে না।
অশ্বিনী সহসা আর কিছু বলতে পারেন না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন রঞ্জিতকে। মনের উপর একরাশ ভাবনা খেলে যায়। বাগানবাড়ি এসে অবধি রঞ্জিতের সম্বন্ধে শুনছেন। বিনয়ের কাছে শুনেছেন; রাস্তার ওপারে ডেভিড সাহেবের কনট্রাক্টর এবং আরও অনেকের কাছে শুনেছেন। মানুষটা বাইরে একটু রুক্ষ বটে, কিন্তু ভিতরটা কোমল। এমন বুদ্ধিমান অধ্যবসায়ী মানুষ হয় না। পৈত্রিক কিছু ছিল অবশ্য। কিন্তু তার উপরে বিস্তর বাড়িয়েছেন নিজের চেষ্টায়। আরও হত, ভাই ইন্দ্রজিত খানিকটা হত যদি

ওঁর মতন। অহোরাত্র নিজের খেয়ালে না থেকে দাদার পিছনে এসে দাঁড়াত। তা হলে বাঙালির মধ্যে একজন পয়লা নম্বরের শিল্পপতি হয়ে উঠতেন।

এত সমস্ত ভেবে নিচ্ছেন লহমার মধ্যে। রঞ্জিত তাড়া দিলেন: কথা বলছেন না যে?

রঞ্জিত তাড়া দিলেন: কথা বলছেন না যে?

থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, পরম সৌভাগ্য আমার বাঁশির।

বলতে পারেন যে বয়স হয়েছে—

অশ্বিনী বলেন, নিতান্ত শত্রু ছাড়া অমন কথা কেউ বলবে না। দশটা ছোকরার মাঝখানে দাঁড়ান গিয়ে হুজুর, আলাদা করে কে বের করতে পারে দেখি।

রঞ্জিত মৃদু হেসে বলেন, সে ঠিক। চেহারা কিম্বা চালচলন দেখে বয়স হয়েছে কেউ বলবে না। ইন্দ্রজিতের পাশাপাশি দাঁড়ালে লোকে তাকেই বড়ভাই বলে, আমায় বলে ছোটভাই। খাড়া হয়ে চলি, একটা দাঁত পড়েনি। মাথার সামনে টাক, পিছনদিকটা ছাঁটাই—কাজেই পাকা চুলের কথা ওঠে না। তবু বয়সের দিকটা ভাবতে হবে বই কি। হঠাৎ যদি মরে যাই, সেই জন্য বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ি আপনার মেয়ের নামে দানপত্র করে দেব। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই। আর কোন কোন ব্যবস্থা করা যায়, ধীরেসুস্থে ভেবে দেখব।

পাটোয়ারি অশ্বিনী গদগদ হয়ে উঠলেন: উঃ, বিবেচনা কতদূর! পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে আসছেন—যাবতীয় ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই। সাধে কি আপনি দেশবিখ্যাত হয়েছেন রায়মশায়।

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিত বলেন, রশুন, আরও আছে। বিয়ে কিন্তু কাল অথবা পরশু। খুব বেশি তো পরশুদিন—রবিবারে। তার বেশি সবুর সইবে না। সোমবার পাটনা-হাইকোর্টে মোকদ্দমা।

অশ্বিনী অবাক হয়ে বলেন, শুভকর্মে দিনক্ষণ আবশ্যক। পাঁজিতে ভাল দিন যদি না থাকে—

তার জন্যে ভাববেন না। পুরুতমশায়রা অদ্ভুতকর্মা। গরজ জানিয়ে উপযুক্ত দক্ষিণা ছাড়লে ঠিক ওঁরা দিন বের করে দেবেন। গরজ বলে গরজ। ছোটভাই ম্যানেজার দু-জনে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। দেরি করলে কত দিক দিয়ে আরও কতজন এসে জোটে, ঠিক কি।

অরক্ষণীয়ার জন্ত শাস্ত্রে বিশেষ বিধি—তা এর চেয়ে অরক্ষণীয়া পাত্রী কবে কোথায় হয়েছে ?

একটু থেমে রঞ্জিত আবার বলেন, নয় তো গোধূলিলগ্নে। গোধূলিতে দিনক্ষণ লাগে না। রবিবারে হলে মন্তোর ক'টা পড়েই অমনি স্টেশনে ছুটতে হবে। এক মিনিট দেরি করতে পারব না। আমি পাটনায় চলে গেলে ওরা সব এসে আবার পাকচক্কোর না দেয় সেজন্ত একেবারে গোড়া মেরে রেখে যেতে চাই।

তবু অশ্বিনী ইতস্তত করেন : এই একটা-ছুটো দিনের মধ্যে যোগাড়-যন্তর হয়ে উঠবে কি ? বিয়েথাওয়ার ব্যাপার—হাঙ্গামা কত বুঝতেই পারেন। বহুদর্শী লোক, আপনাকে কী বোঝাব।

হতেই হবে। গম্ভীর হয়ে রঞ্জিত বলতে লাগলেন : টাকা খরচ করলে কলকাতা শহরে একটা-ছুটো ঘণ্টায় বাঘের দুধের যোগাড় হয়ে যায় মশায়। এ তবু পুরো ছুটো দিন হাতে পাওয়া যাচ্ছে। সকালবেলা আমি হাজার তিনেক টাকা নিয়ে আসব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যতটা পারি যোগাড়যন্তর করে দিয়ে যাব। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই—বরযাত্রী একটি প্রাণীও আসবে না, জানতেই দেব না কাউকে। সে জাঁকজমক পাতিপুকুরে ইন্দ্রজিতের বিয়ের সময়। খাওয়ানোর মধ্যে রইল শুধু কন্তাযাত্রীরা—বাগানে আপনার সঙ্গে যাঁরা সব এসে ঘর তুলেছেন। সে আর কত। চার-পাঁচ শ টাকার মধ্যে এদিককার সব হয়ে যাবে, বাকি টাকা আপনার। তা ছাড়া শ্বশুর হয়ে গেলে তখন আর রিফিউজি রইলেন না—কুটুম্ব হলেন। বাগানবাড়িতে থাকলে তখন আপত্তি উঠবে না। ভাঁটের সঙ্গে থাকতে পারবেন যদ্দিন-না ভাল রকম কিছু বন্দোবস্ত হচ্ছে।

বিস্তর পেরে যাচ্ছেন—আশার অতীত। তৎসত্ত্বেও অশ্বিনী নতুন পাড়াটার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বলেন, ভাল বন্দোবস্ত শুধু আমার হলেই তো হবে না। ওদের কি হবে হুজুর ?

আমার ছেলেই ওদের সব এনে বসাল, তার উপরে ভরসা করে দেশ-ভুঁই ছেড়ে চলে এসেছে।
রঞ্জিত অমায়িক ভাবে বলেন, কুটুম্বর লোক যখন—ওঁরাও কুটুম্ব ছাড়া কি! অন্ত সুবিধা না হওয়া অবধি যেমন আছেন, থাকবেন। কি বলবেন বলুন এবারে। আমায় উঠতে হবে। এর পরেও যদি আপত্তি থাকে, বলে দিন।
খুশিতে ডগমগ হয়ে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে না, কিসের আপত্তি।
গড়গড়া টানছিলেন রঞ্জিত, এই কথার পরে মুখের নল নামিয়ে গড়গড়া খানিকটা দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, জামাইকে কেউ 'আজ্ঞে' বলে না। বলুন—না, বাবাজি।
থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, সে তো বটেই। কিন্তু আলাপ-পরিচয় এই মাত্তর হল—এক্ষুনি সঙ্গে সঙ্গে হবে না। সইয়ে সইয়ে নিতে হবে। কন্যা-সম্প্রদানের পর মুখ দিয়ে 'বাবাজি' বেরুবে।
উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত সামাল করে দেন: কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারও কানে না যায়। ইন্দ্রজিত হোক পুলিন হোক, কাউকে বলবেন না। বিনয় কম্পাউণ্ডের ভিতর থাকে, তার কাছে একেবারে গোপন রাখা যাবে না। কিন্তু সবখানি বলবেন না। বিয়ে ঠিক হয়েছে, এই অবধি বলতে পারেন—কে বর কি বৃত্তান্ত, টের পেয়ে না যায়। শুভকাজে বাগড়া অনেক। মন্তোর ক'টা পড়া হয়ে গেলে যত খুশি ঢাক পিটিয়ে বেড়াবেন। আগে-ভাগে যদি চাউর হয়ে পড়ে, বুঝব আপনার থেকে হয়েছে। আমার মেজাজ চড়ে যাবে, সমস্ত-কিছু পণ্ড হবে। আপনার আপন লোক যাঁরা আছেন, সকলকে বুঝিয়ে দেবেন এটা ভাল করে।
যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী ঘাড় নোয়ালেন।

রঞ্জিত রায় বিদায় হলেন তো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা এইবার। ভাল হল কি মন্দ হল। অশ্বিনী যত ভাবেন, পুলকিত হয়ে উঠছেন ততই। বলতে মানা করে গেলেন, নইলে জাঁক করে বলে বেড়াবার মতন পাত্র। নিঃসম্বল ভিখারির অবস্থায় মেয়ের এমন বিয়ে ভাবতে পারা যায় না। আকাশের চাঁদ জামাই হবার জন্ত হেঁটে এসে উঠলেন। বয়সটা কিছু বেশি এবং তিনটে ছেলে-মেয়ে বর্তমান—এ দুটো ব্যাপার বলতে পারেন চাঁদের গায়ের কলঙ্ক। চাঁদ তাতে ছোট হয় না।

বিরজা বাঁশিকে এইটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছেন, তিনিও খুশি : বয়স তা কী। হরগৌরীর মিলন। জামাইয়ের খাঁটি বয়স বলে না দিলে কে বুঝবে ? তা-ই বা কত আর। ছেলেমেয়ের কথা যদি বল—ভালই তো, ভরভরন্ত সংসার। বাঁশি গিয়ে পড়লে তখন কি মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ, আর ছেলে দিদিমার কাছে পড়ে থাকবে ? বাড়ি এসে মা-মা করে সর্বক্ষণ পিছন পিছন ঘুরবে। মেয়েমানষের এর বড় সুখশান্তি কিসে ?

শুধুমাত্র সদাশিব দোমনা : তা হোক, তা হোক—বাঁশি বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ তোমরা।

শুভকর্মের ব্যাপারে বারম্বার এমনি বিরুদ্ধ কথায় বিরজা চটে উঠলেন : সংসারধর্ম কোনদিন করলে না, তুমি এসবের কি বোঝ শুনি ? বড় হয়েছে মেয়ে, বোঝে সব—হিত ছাড়া আমরা যে তার অহিত করব না, তা-ও সে বোঝে। বাঁশি কি ঘর করে দেখেছে রঞ্জিত-বাবাজির সঙ্গে—আগেভাগে সে কি বলতে যাবে। কাল বাদে পরশু হল বিয়ের দিন—অন্ত-কিছু বললেও তো এড়ানো যাবে না।

সদাশিব যা হয় বলুনগে, আসল ভয়টা আশিসকে নিয়ে। অঙ্কের

মতামতের কিছুমাত্র পরোয়া করে না সে। মা-হারা পিঠোপিঠি ভাই-বোন একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, আশিস বিগড়ে গেলে বিপদ। একদঙ্গল হুটকো জোয়ান ছেলে তার হাতে, বিয়ের সময় হঠাৎ কোন বিভ্রাট ঘটিয়ে বসা তার পক্ষে অসাধ্য নয়।

আশিস এলে বিরজাই কথাটা পাড়লেন। আদ্যোপান্ত বলে ভয়ে ভয়ে তাকান মুখের দিকে। যা ভেবেছিলেন, ঠিক তার উল্টো। একমুখ হাসি নিয়ে আশিস তারিফ করে : বাঃ-বাঃ, কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না, দিব্যি হল। এতগুলো পরিবারের সুব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। পরের মঙ্গলের জন্য লোকে জীবন পর্যন্ত দেয়। এ শুধু বিয়ে করা একটা মানুষকে। বাঁশির তো লাফাতে লাফাতে গিয়ে কনেপিঁড়িতে বসা উচিত। কোথায় গেল বাঁশি ?

চিৎকার করে বোনকে ডাকছে : বাঁশি, ওরে বাঁশি—

বাঁশি সাড়া দিল না।

আশিস উৎসাহ ভরে বলে যায়, বিয়ের আগে কথা আদায় করে নিতে হবে, খুব ভাল ব্যবস্থা না করে একটি প্রাণী বাগানবাড়ি থেকে নড়ানো চলবে না। এগ্রিমেণ্ট না লেখানো যায়, অন্তুতপক্ষে দশের মুকাবেলা বলবেন উনি।

সদাশিব শুনছিলেন এতক্ষণ নির্বাক হয়ে। বললেন, কেবল নিজেদের দিকটাই দেখছ আশিস। বোনের দিকটা দেখতে হবে না একটু ?

আলবৎ! দেখব বই কি মাস্টারমশায়।

হাসতে হাসতে আশিস বলে, বাঁশির নামে বাড়ি লিখে দেবে বলেছে, তারও পাকা বন্দোবস্ত চাই বাবা। কাজ সারা করে নিয়ে শেষটা ফাঁকি না দেয়। বাগানবাড়িতে যদি সত্যি সত্যি বিস্কুটের কারখানা করে, সেটা এবার জয়ন্তী বিস্কুট-ফ্যাক্টরি নয়। নাম দিতে হবে বাঁশি বিস্কুট-ফ্যাক্টরি।

সদাশিব বিরক্ত হয়ে বলেন, শুধু টাকাকড়ি কাজকারবারের কথাই

নয়, কোন লোকের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিচ্ছ, সেটা একবার ভেবে দেখ। রঞ্জিত রায়ের বয়সটা জানা আছে ?

আশিস অবহেলার ভাবে বলে, বয়স হল তো কি হয়েছে ? বিধবা

ঝাঁপি বলে, ও বিনয়-দা, সর্বনাশ !

হবে বাঁশি? বয়ে গেল, বোনের আবার বিয়ে দেব। কিম্বা বেঁচে থেকেও যদি বনিবনাও না হয় বরের সঙ্গে? ডিভোর্স-আইন পাশ হবে, খুব বেশি দেরি নেই তার—এককাঁড়ি টাকা আদায় করে নিয়ে বোন আলাদা থাকবে।

সদাশিবকে চটিয়ে দিয়ে আশিস বলল, আচ্ছা, বলছেন যখন বাঁশিকেই একবার জিজ্ঞাসা করা যাক।

বাঁশি, বাঁশি—করে ডাকছে। বাঁশি নেই।

বাঁশি তখন বিনয়ের কোয়ার্টারে গিয়ে পড়েছে। বিনয় কি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরল। বাঁশি বলে, ও বিনয়-দা, সর্বনাশ! পরশুদিন যে আমার বিয়ে।

কেন জানি, ক্ষেপানো কথা বলে বিনয়ের অনুমান হল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে বলে, ভালই তো! জেঠামশায়ের দায় উদ্ধার হল, গলার কাঁটা নামল। বরটা কে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত—ইন্দ্রজিত না পুলিনবিহারী?

দু-জনের কেউ নয়। ওদের চেয়ে অনেক বড়। সকলের মাথা যিনি—বড়বাবু রঞ্জিত রায়।

বিনয় অবাক হয়ে যায়: বল কি গো! জয়ন্তী দেবী বছর দশেক গত হয়েছেন। শুনতে পাই, অগুন্তি সম্বন্ধ এসেছিল তখন—বন্যার জলের মতন। এখনও আসে দুটো-পাঁচটা। এই দশ বছর মাসে গড়পড়তা একটা করে সম্বন্ধ ধরলেও বার-দশকে একশ কুড়ি। কাউকে আমল না দিয়ে বড়বাবু এদ্দিন তবে তোমারই অপেক্ষায় ছিলেন?

বাঁশি ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলে, রাজকন্যার অপেক্ষায়।

বিনয় বলে, সত্যি, কপাল বটে তোমার বাঁশি! অবাক হয়ে যাচ্ছি।

হি-হি করে হাসতে লাগল। বাঁশি তাড়া দিয়ে ওঠে, দাঁত বের করে হেসো না অমন। দেখতে বিশ্রী লাগে।
তাড়া খেয়ে বিনয়ের উচ্ছ্বাস বন্ধ হয়। হাসির রেখাটুকু মাত্র মুখের উপরে। সেদিকে তাকিয়ে বাঁশি আবার বলে, দেখ, কেঁদে কেঁদে হাসা ওর নাম। আমি সেটা বুঝি। দেখে গা জ্বালা করে। হেসে হেসে মজা না দেখে কি করতে হবে সেইটে ভাব। রঞ্জিত রায়কে কোন কায়দায় ঠেকাবে ?
বিনয় বিস্ময়ের ভান করে বলে, বল কি গো, বড়বাবুকেও ঠেকাতে হবে! এ বড় বিষম ঠাঁই। ম্যানেজার ঠেকালাম ছোটবাবুকে দিয়ে, ছোটবাবু ঠেকালাম বড়বাবুকে দিয়ে। বড়বাবুর উপরে আর নেই। একটু থেমে তরল সুরে আবার বলে, কিন্তু হল কি তোমার বাঁশি, এ বরও পছন্দ নয়? পুরুষসিংহ বলে শহরজোড়া নামডাক—
মুখ বাঁকিয়ে বাঁশি অবিকল সেই সুরে পত্ত মিলিয়ে বলে, সিংহের কেশর নেই একগাছি, মাথাজোড়া টাক। পরশুদিন বিয়ের সময় কনে খুঁজে যদি না পাওয়া যায়, তোমায় বলা রইল বিনয়-দা, ঝিলের জলে খুঁজবে। কনে মরে ভাসছে, দেখতে পাবে।
বলে ফরফর করে বাঁশি চলে গেল।

বিনয়ের ভাবনা হল। বাঁশি ভয় দেখিয়ে গেছে, কিন্তু না হলেও এবারের বিপদ বড় কঠিন। কাজকর্মে প্রায়ই ভবানীপুর রায়বাড়ির অফিসে যেতে হয়—পরের দিন শনিবার সকাল সকাল সে চলে গেল। পুলিনের কাছে গিয়ে নিচু গলায় অন্তরঙ্গভাবে বলে, একটা কথা ম্যানেজারবাবু। বড়বাবু ছোটবাবু দু-জনেই আমাদের মনিব—সমান সম্বন্ধ। উভয়ের নুন খাই আমরা। ঠিক কিনা বলুন।
পুলিনবিহারী খবরের-কাগজ পড়ছিল। অন্তমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ—

ছোটবাবুর বিয়ের কথা যেমন বড়বাবুকে জানানো হয়েছিল, বড়বাবুর বিয়ের কথাও তেমনি ছোটবাবুকে বলতে হয়। নয় তো উনি বলবেন একচোখো কর্মচারী। বদনাম হবে আমাদের।

হাতের কাগজ ফেলে সচকিত হয়ে পুলিন বলে, দাদা বিয়ে করছেন নাকি? সত্যি খবর? কোথায় হচ্ছে—কবে?

বিবরণ শুনে পুলিন অবাক হয়ে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপর জ্বলে উঠল: আমরা সামান্য লোক—কীটানুকীট। কত রকম ঝাগড়া উঠল তখন, কুলশীল চাকরিবাকরি নিয়ে কত কথা। 'দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখল মানুষের বেলা'—ওঁরা দেবতাগোঁসাই, ওঁদের দোষ কিছুতে হয় না। এত বড় আনন্দের ব্যাপারটা কাক-পক্ষীকে জানতে দিচ্ছেন না। আমরা বাজে লোক, গোলাম-নফর—আমরা জানি না জানি কিছু যায় আসে না। কিন্তু একেবারে আপন যারা, তাঁদের মনের অবস্থা কি হবে? তুমি ঠিক বলেছ বিনয়। বেশি বয়সে হঠাৎ এই রকম বিয়ে—দাদা লজ্জায় বলছেন না, কিন্তু আমাদের একটা কর্তব্য আছে বইকি!

সেই কর্তব্যের তাগিদে পুলিন বসে বসে আর খবরের-কাগজ পড়তে পারে না। উঠে পড়ল। ইন্দ্রজিতের ঘরে খোঁজ নিল, এখনো ফেরেনি কুস্তির আখড়া থেকে। পথের উপর পায়চারি করে, আর ভাবে। গোখরোসাপ খুঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে এ সময়টা। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করে ধীর পায়ে এগোবে।

ইন্দ্রজিত ফিরে এলে পুলকে ডগমগ হয়ে পুলিন বলে, আনন্দের খবর! দাদার এতদিনে সুমতি হল। বিয়ে করছেন। দশ বছর ধরে সংসারটা কী রকম ছন্নছাড়া হয়ে আছে, শ্রীছাঁদ আবার ফিরবে।

ইন্দ্রজিত প্রথমটা বিশ্বাস করে না। আহত কণ্ঠে বলে, তুমি জেনেছ—কিন্তু আমায় তো দাদা একটা কথাও বললেন না।

পুলিন বলে, বলেন নি আমাকেও। এতটা বয়সে বিয়ে—আর ধরুন আপনার বউদি জয়ন্তী দেবীর নাম জুড়ে দিয়ে কত কত কাজ-কারবার করলেন—বলতে লজ্জা হয়েছে বোধহয়। কিন্তু এবাড়ির কোন কাজটা আমার অজান্তে হতে পারে? খবর ঠিক এসে যায়। বিয়ে কালকেই—গোধূলিলগ্নে। বিয়ে করে বরাসন থেকে উঠেই অমনি অমৃতসর-মেল ধরতে হাওড়া স্টেশন ছুটবেন।

পরামর্শ অনেক হল। কেলেঙ্কারি কেমন করে বন্ধ করা যায়—হ্যাঁ, কেলেঙ্কারি তো বটেই—রঞ্জিত রায়ের মতো মানুষ একটা রিফিউজি মেয়ের রূপে মজে তিন তিনটে ছেলেমেয়ে বর্তমান থাকতে বুড়োবয়সে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। লোকে ছি-ছি করবে, হয়তো বা ছড়া বাঁধবে তাঁর নামে—মোহে আচ্ছন্ন বলেই এ-সমস্ত মাথায় আসছে না তাঁর। বিয়ে বন্ধ করে শুধুমাত্র রঞ্জিতকে বাঁচানো নয়, রায়বাড়ির ইজ্জত বাঁচানো।

পুলিন বারম্বার সতর্ক করে দেয়। বলে, আমি এর মধ্যে আছি, দাদা কোন গতিকে টের পেলে ঘাড়ের উপর আমার মাথা থাকবে না। আপনি আছেন, তা-ই বা প্রকাশ হবে কেন? ধরে নিন বিয়ের ব্যাপারের কেউ আমরা কিছু জানিনে।

ইন্দ্রজিত একটুখানি ভেবে নিয়ে অভয় দিল পুলিনকে: দাদা যখন আমায় অবধি বললেন না, কি জন্যে তবে জানতে যাব? তুমি কিছু জান না, আমিও জানিনে। যা করবার নিশ্চিন্ত হয়ে করে যাও পুলিন-দা। আমার মুখ দিয়ে কখনো কিছু বের হবে না।

এত কথার পরেও পুলিনবিহারী পুরোপুরি ভরসা পায় না। বলে, কাজকর্ম সমস্ত করে দিচ্ছি ছোটবাবু, কিন্তু নিজে আমি আড়াল থাকব। বাগানমুখোই হব না তখন। এ নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না আপনি।

ইন্দ্রজিত হেসে উঠে সায় দিল: তখন তার কাজকর্ম কি? মজা দেখা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। না গেলে মজা দেখা মাটি হবে তোমার।

॥ উনিশ ॥

ইন্দ্রজিতকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে পুলিনবিহারী এবার নেবুতলা ছুটল।

রঞ্জিতের শ্বশুরবাড়ি। ছেলে রন্টু এখানে থাকে শাশুড়ি জাহ্নবী দেবীর কাছে। এটা-সেটা নিয়ে প্রায়ই আসতে হয়, জাহ্নবী দেবী পুলিনকে ভাল মতন চেনেন।

সাষ্টাঙ্গে পুলিন প্রণাম করে: এদিকে এসেছিলাম মা, তাই ভাবলাম, কেমন আছেন খবরটা নিয়ে যাই।

জাহ্নবী দেবী বলেন, বেশ করেছ। কালই তোমার কথা হচ্ছিল। অনেকদিন বাগানের ডাব আসেনি, রন্টু ডাব-ডাব করে। বলি, নিজেদের অতগুলো গাছ রয়েছে তো বাজারে কিনতে যাই কেন? পুলিন একটা খবর পেলেই তো পাঠিয়ে দেয়।

পুলিন হাঁ-হাঁ করে: সে তো বটেই। বাজারের ডাব কেন কিনতে হবে? বাগানে কাঁদি-কাঁদি ডাব—রন্টুরই তো সব। কী আশ্চর্য, বিনয়কে আমি গেল-হপ্তায় বলে দিয়েছি—পাঠায়নি বুঝি? রিফিউজিরা বাগানে এসে ঢুকেছে। তবে এরা ভদ্রলোক, গাছ-গাছালির ক্ষতি করে না, ঘর বেঁধে আশ্রয় নিয়ে আছে এই পর্যন্ত। আচ্ছা মা, এক্ষুনি গিয়ে আমি বিনয়ের কাছে দরোয়ান পাঠাব। ডাব পাড়িয়ে তাড়াতাড়ি যাতে পাঠায়।

জাহ্নবী দেবী বলেন, পাড়িয়ে রেখে দিতে বোলো। কবে কাকে দিয়ে পাঠাবে—অত ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই। ফি রবিবার আমি দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দিরে যাই। ফিরতি মুখে বাগান ঘুরে আসব না হয়।

পুলিন অনুনয় করে বলে, তাই যাবেন মা। লোকজনের বড্ড অসুবিধে, সেই জন্যে সব সময় পাঠানো হয়ে ওঠে না। নইলে বিনয়ের গাফিলতি নেই। ডাব পাড়া থাকবে—এককাঁদি দু-কাঁদি

খা মোটরে ধরে, নিয়ে আসবেন। কাল শুধু ঐ এক রবিবারের কথা নয়, প্রতি রবিবারে ফিরতি পথে যদি এককাঁদি করে তুলে নিয়ে আসেন, রন্টুরা খেতে পারবে।

ইন্দ্রজিত ওদিকে মেয়েদের বোর্ডিং-এ ছুটল। একেবারে কলের মতন কাজ হচ্ছে। ইলু নীলু থাকে এখানে। তাদের ডাকিয়ে এনে ইন্দ্রজিত বলে, বাগানে পিকনিকের কথা বলে থাকিস—কাল তো রবিবার আছে, যাবি ?
দু-বোনে নেচে ওঠে : হ্যাঁ কাকামণি, কালই। কখন নিয়ে যাবে ? বড়-দিদিমণিকে তুমি বলে যাও, আমরা তৈরি হয়ে থাকব।
ইন্দ্রজিত বলে, শখ করে একদিন পিকনিক করবি—আমি বলি, বাজারের মাছ কেন কিনতে যাই, ঝিলে মাছ ধরিয়ে রান্নাবান্না করব। বেড়জাল টেনে মাছ তুলবে—সে-ও এক দেখবার জিনিস।
মেয়েরা পরমোৎসাহে বলে, সেই ভাল কাকামণি। ঝিলের মাছ ধরে সেই মাছ রান্না হবে। বাজারের মাছ তো রোজ খাই।
ইন্দ্রজিত বলে, তা হলে বরঞ্চ চান-টান করে দুপুরের মতো চাট্টি খেয়ে নিস। পিকনিকের খাওয়া খেতে দেরি হবে, হয়তো বা সন্ধ্যে। তৈরি হয়ে থাকিস তোরা, এগারটা নাগাত জীপ নিয়ে এসে আমি তুলে নেব।
নীলু বলে, খেয়েদেয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাকব। তুমি কিন্তু মোটেই দেরি করবে না কাকামণি। দেরি হলে দেখো—
ইলু বলে, চার-পাঁচটা বন্ধু নিয়ে যাব সঙ্গে। মানুষ বেশি না হলে পিকনিক কিসের ? অ্যাঁ, কাকামণি ?
ইন্দ্রজিত সায় দিল : বেশ তো, বেশ তো। এই তবে ঠিক রইল—

ইলু নীলু আর তাদের চার বান্ধবী সকাল সকাল খেয়ে তৈরি হয়ে আছে। বারম্বার উপর-নিচে করছে। ইন্দ্রজিতের দেখা নেই। কি হল, ভুলে গেল নাকি কাকামণি? বান্ধবীদের কাছে অপদস্থ হতে হচ্ছে। অভিমানে মুখ থমথম করছে দু-বোনের।
সুপরিচিত জীপ দেখা দিল অবশেষে। তখন অপরাহ্ণ। দু-বোনে ছুটে এল: পিকনিকের লোভ দেখিয়ে…কি হয়েছে বল কাকামণি? কোন অ্যাকসিডেন্ট হল কিনা, ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলাম। ঝিলে মাছ ধরা হবে, আমরা সব দেখব—সেই জন্যে দেখ কখন থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।
ইন্দ্রজিত বলে, মাছ-ধরা নিয়েই তো হাঙ্গামা। কসবা অবধি গিয়ে জেলে ঠিক করলাম। তাদের আবার ছেঁড়া-জাল। জাল ভাড়া করতে বেরুল দুই টাকা অগ্রিম নিয়ে। বাড়ি ফিরে এসে আমিও ছটফট করছি ঠিক তোদের মতন। বারটা অবধি দেখে খোঁজ নিতে আবার কসবায় গেলাম। জাল ভাড়া করতে তারা সেই গেছে তো গেছে—পাত্তা নেই। মাছ ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে তখন মাছ কেনার চেষ্টা। কোন বাজারে মাছ নেই, মাছে বরফ চাপা দিয়ে ব্যাপারিরা ঘুমুচ্ছে। শেষটা বৈঠকখানা-বাজারে এসে অনেক ধস্তাধস্তি করে ঐ দুটো কিনলাম।
ভারী ওজনের দুটো রুই। বিস্তর খেটেছে ইন্দ্রজিত। মাছ শুধু নয়, চাল-ডাল, তেল-ঘি, আনাজ-মশলা কিনে সিটের পাশে গাদা করেছে। বলে, ঠাকুর-চাকর বাসে রওনা করে দিয়েছি। এতক্ষণে বাগানে পৌঁছে যাবার কথা।
ইলু বলে ওঠে, বা-রে, ঠাকুরে রান্না করল তো পিকনিক কিসের? সে তো বাড়ির খাওয়া। রাঁধব আজ আমরা—যত জনে যাচ্ছি সকলে মিলে রাঁধব। ঠাকুর আজকে আমাদের রান্না খাবে।

॥ বিশ ॥

ফটক পার হয়ে জীপ ঢুকে যেতে নীলু সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে : বাবা যেন ওই—বাবাই তো! বড্ড মজা হল, পিকনিকে আজ বাবাকেও পেয়ে গেলাম।

ইলু চেঁচাচ্ছে : ও বাবা, এই দিকে—এই দেখ, আমরা সব এসেছি।

ডাক শুনে রঞ্জিত দ্রুতপায়ে গাড়ির কাছে এলেন।

ইন্দ্রজিত বলে, ইলু-নীলুর বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম কাল। বাগানে এসে পিকনিক করবে, অনেকদিন থেকে বলছে। এবারে কিছুতে ছাড়ল না। ঝিলে মাছ ধরা হবে, ওদের বড় ইচ্ছে। কিন্তু জেলে জোটাতে পারলাম না। শুধু-শুধু দেরি হয়ে গেল। কখন যে কি হবে, জানিনে।

রঞ্জিত উষ্ণকণ্ঠে বলেন, রিফিউজিরা এসে পড়েছে, এসময়টা গণ্ডগোল চলছে। হাঙ্গামার মধ্যে ছেলেমানুষদের কোন আক্কেলে নিয়ে এলে, শুনি?

ছাড়ে না যে—কী করব।

তারপর দূরে অশ্বিনীদের দখল-করা সেই ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিত ফোঁস করে এক নিশ্বাস ছাড়ল। বলে, নড়ছে না কিছুতে? উঃ, কী ঝামেলা যাচ্ছে যে আপনার! দুটো দিনের জন্যেও যদি কলকাতা এলেন, তিলার্ধ জিরোবার ফুরসত হয় না। আবার এই এক তালে এসে পড়লেন।

ইলু বলে, বাবা তুমি খাবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

গাড়ি ধরতে হবে যে। পাটনায় কাল মোকদ্দমা।

তোমার গাড়ির আগে রান্নাবান্না হয়ে যাবে। ঠাকুরকে রাঁধতে দেব না তো, আমরা আজ রান্না করব। কত তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারি, দেখিয়ে দেব। না খেলে ছাড়বই না।

নীলু বলে, কোন জায়গায় উনুন করা যায় বল তো কাকামণি?

ইলু বলে, পাকাবাড়ির বারান্দার উপরটায়। বাগানে পোকামাকড়, নোংরা—

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি বলেন, তবে আর বলছি কি। পাকাবাড়ি রিফিউজিরা দখল করে বসেছে। এদিকে সেদিকে চালাঘর বেঁধে পাড়া জমিয়েছে। ওদের ধারেকাছে যাবি নে তোরা। যা করতে হয় ঝিলের এ-পারে—পুল পার হবিনে, খবরদার! গুণ্ডা-বজ্জাত যত—মারধর না-ই করুক, দুটো অপমানের কথাও বলতে পারে।

ইন্দ্রজিত গর্জে উঠল : আমার ভাইঝিরা সব এসেছে—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, বলে দেখুক না একবার। জিভ টেনে ছিঁড়ব না ?

রঞ্জিতও সমান তেজে ভাইকে ধমক দিয়ে ওঠেন : মেয়েরা আমোদ করে বনভোজনে এসেছে, তুমি এর মাঝে গণ্ডগোল বাধাতে যেও না—মানা করে দিচ্ছি। যদি কিছু করতে হয় আজকের দিনটা কাটুক, বোর্ডিং-এ চলে যাক এরা ভালয় ভালয়, তারপরে।

মেয়েদের বোঝাচ্ছেন : নাম হল যার বনভোজন—বনে-বাগানেই খেতে হয় রে। বারান্দার উপরে খাবি তো বোর্ডিং-এর ডাইনিং-রুমের দোষটা কি হল ? পিকনিক করতে এসেছিস, আমি বলি, পাঁচিলের ধারে উই যে লতাপাতায় ঘেরা জায়গা, ওরই আশেপাশে কোথাও উনুন খুঁড়ে নিগে যা।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বর ফেরত জাহ্নবী দেবীর মোটর এসে পড়ল। রন্টু দিদিমাকে ছেড়ে থাকে না, জাহ্নবী দেবী নেমে পড়ে হাত ধরে তাকে নামিয়ে নিলেন।

বাবা ঐ যে! ও বাবা, বাবা গো—

ছুটে গিয়ে রন্টু রঞ্জিতের হাত জড়িয়ে ধরেছে। ষোলকলা পরিপূর্ণ। ইলু-নীলুর আরও উল্লাস—আজকের পিকনিকের মধ্যে ছোটভাইটা এবং দিদিমাকে সুদ্ধ পাওয়া গেল। এসেই জাহ্নবী দেবী ভিড়ে পড়েছেন। রঞ্জিতকে ডাক দেন : ওদিকে কি তোমার,

ছটফট করছ কেন বাবা ? বিষয়কর্ম একটা দিন থাকুক, পাটনা থেকে ফিরে এসে যা করবার কোরো। ছেলেটা কী করছে দেখ— কাছে তো পায় না। হাত ছাড়িয়ে চলে যেও না বাবা, দুঃখ পাবে।

ঠাকুর ও চাকর যেইমাত্র এসে পা দিয়েছে, ইলু সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিল : যাও, দেখেশুনে বেড়াওগে তোমরা। ঘণ্টা দুই পরে এসে নেমন্তন্নে বসবে। হাতা-খুন্তি ছুঁতে দিচ্ছিনে, ওসব আজ আমাদের দখলে। যাও চলে, দাঁড়িয়ে থেকে করবে কি ?

বিনয়েরও নিমন্ত্রণ। যখন যেটা আটকায়, আগ বাড়িয়ে এসে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এক সময় জাহ্নবী দেবী বললেন, ডাব পাড়িয়ে রেখেছ বিনয়—পুলিন কিছু বলে নি ? আমার গাড়ির পিছনে এককাঁদি ডাব তুলে দিও, ভুলে যেও না।

বিনয় বেকুব হয়ে বলে, নানান গণ্ডগোলে কাল হয়ে ওঠেনি। পাড়ানি ঠিক আছে—ডেভিড সাহেবের জায়গায় কাজ করছে, ওদের একজন। কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে গাছে উঠবে। আছেন তো আপনি, যজ্ঞি না মিটিয়ে যেতে পারছেন না।

ইন্দ্রজিত রান্নার কাঠ কেটে দিচ্ছিল। কানে গিয়েছে। সে বলে, যজ্ঞি তো শুনতে পাচ্ছি আরও একটা আজ এখানে। রিফিউজিদের আস্তানায়। তুমি এখানকার মানুষ বিনয়, তোমার কানে কিছু যায় নি ?

বিনয় নিরীহ চোখে-তাকিয়ে পড়ল।

ইন্দ্রজিত একগাল হেসে বলে, রিফিউজিদের মেয়ের বিয়ে যে আজকে। এই এখনই—গোধূলিলগ্নে। নেমন্তন্ন করেনি তোমায় ? কী আশ্চর্য !

রঞ্জিত এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে বিনয়কে ডাকলেন : একটা কথা শোন বিনয়। ওদিকে চল। খুব একটা জরুরি ব্যাপার।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিম্নকণ্ঠে বলেন, পিকনিক নিয়ে মেতে থাকলে হবে না এখন। অনেক রকমে ভেবে দেখলাম, তুমি ছাড়া সে কাজ হবে না।

বিনয় হাত কচলে কৃতার্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে, যা আপনার হুকুম—

রঞ্জিত লুফে নিয়ে বলেন, সে তো জানিই। কত লোকে কত নিন্দেমন্দ করতে আসে তোমার নামে, কিন্তু ঐ বিশ্বাসটা আছে বলেই সব কথা ঝেড়ে ফেলে দিই।

আবার ভাবেন একটুখানি। তারপর বলে ফেললেন, অশ্বিনীবাবুর মেয়ের বিয়ে আজকে। বিয়েটা তোমাকেই তো করে ফেলতে হয়।

বিনয় আকাশ থেকে পড়ে : আমি ?

তা ছাড়া কোন উপায় দেখিনে। খবর রাখ কিনা জানিনে, আমায় ওঁরা বড্ড ধরে পড়লেন। রাজি হতে হল। নয়তো বাগানবাড়ি বেদখল হয়ে থাকে, বিস্তর ফেরে পড়তে হয়। বিস্কুট-ফ্যাক্টরির জন্য মেশিনের অর্ডার দিয়ে ফেলেছি, সমস্ত বরবাদ হয়ে যায়।

বিনয় ঘাড় নেড়ে বলে, আপনি হলেই সর্বাংশে সুন্দর হত বড়বাবু।

রঞ্জিত খিঁচিয়ে উঠলেন : হবে কি করে, বিপদটা দেখছ না! মেয়ে ছুটোর আজকেই পিকনিকের মচ্ছব লাগল। দু-বোনে এল, আবার কলেজের পুরো এক গণ্ডা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যি সেরে শাশুড়িঠাকরুন এসে পড়লেন। রন্টু এসেছে, ইন্দ্রজিত এসেছে। বরাসনে আমি বসতে গেলে এখনই গজকচ্ছপের লড়াই বেধে যায়। মেয়ের আভ্যতিক হয়ে গেছে— রাতের মধ্যে দিতেই হবে বিয়ে। পূর্ব-বাংলার লোক ওরা, এসব বড্ড মানে। বিয়ে না হলে রঞ্জিত রায় বলে খাতির করবে না— ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবে। সেইজন্য তোমায় বলছি।

ইন্দ্রজিত এই সময় দু-হাতে বড় বড় দুই বালতি জল নিয়ে পুকুরঘাট থেকে পিকনিকের দিকে যাচ্ছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে

বিনয় বলল, ছোটবাবু স্বয়ং হাজির রয়েছেন, তাঁর চোখের সামনে—তিনি যে আমায় ধরে ঠেঙাবেন বড়বাবু, তার উপায় কি ?
রঞ্জিত সগর্বে বলেন, তেমন ভাই নয় আমার ইন্দ্রজিত—আমি যদি বলে দিই, ভাই আমার কোমর বেঁধে নিজেই কনের পিঁড়ি ঘোরাতে লেগে যাবে। নিশ্চিন্ত থাক তুমি, সে দায়িত্ব আমার।
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কথাটা আদ্যোপান্ত আর একবার ভেবে নিলেন বোধহয়। সজোরে ঘাড় নেড়ে বলেন, কাদের মেয়ে কোন অঞ্চল থেকে ভেসে এসে উঠল—আধবুড়ো দোজবরে আমার সঙ্গে হলেও হতে পারত, কিন্তু আমার ভাইয়ের সঙ্গে হবে না। পাতি-পুকুরে কথা দিয়ে বসে আছি, ভদ্রলোকেরা আশায় আশায় রয়েছেন, কথা আমি প্রাণ গেলেও ভাঙতে পারব না। তার উপরেও আছে। আমার বিয়ের সময় অবস্থা সেরকম ছিল না বলে বিয়েটা নমো-নমো করে হয়েছে, বুড়োবয়সে এখন বিয়ে করতে গেলেও চোরাগোপ্তা করতে হত। কিন্তু ভাইয়ের বেলা তা নয়। ভাইয়ের বিয়েয় আর মেয়ে ছুটোর বিয়েয় আমি সাধ মিটিয়ে জাঁকজমক করব। ওদের বিয়ে চুপিসারে হতে পারে না।
বিনয় চুপ করে থাকে। রঞ্জিত আবার একটু ভেবে বলেন, পুলিনটা কাছাকাছি থাকলে বরং—উঁহু, তা-ও তো হবে না। বোন-মিলটা উঠে যাবার দাখিল, কলিয়ারির দায় পুলিনের উপর চাপিয়ে আমি এবার মিল নিয়ে পড়ব। ঝরিয়া—পাটনা ছুটোছুটি করে আর মামলা করে বেড়াতে হবে তাকে, বিয়ের রঙ্গে মাতলে হবে না। মামলা মিটে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে চেপে বসুক, তখন বিয়ের কথা। ভেবেচিন্তে দেখছি বিনয়, তুমি ছাড়া গতি নেই। বিস্কুট-ফ্যাক্টরি হতে কিছু তো দেরি আছে, বিয়ে ততদিনে পুরানো হয়ে যাবে। কাজ আটকাবে না।
বিনয় বলে, আমি সামান্য লোক—অশিক্ষিত, গরিব। তবে খুলেই বলি বড়বাবু, অনেক আগে একবার কথাটা উঠেছিল। আমার মায়ের

বড্ড ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রস্তাব ওঁরা কানেই নিলেন না। আমায় ওঁরা মেয়ে দেবেন না কিছুতে।

রঞ্জিত তাড়া দিয়ে থামিয়ে দিলেন : তোমায় যা বলছি, তাই কর। বেলা পড়ে এল, গোধূলির বেশি দেরি নেই। মাথায় টোপর চড়িয়ে চট করে বর হয়ে এস দিকি। মেয়ে দেয় না দেয়, সে বুঝ আমার।

বিনয় নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রঞ্জিত গর্জন করে ওঠেন : নিজের ভবিষ্যৎ খোয়াচ্ছ কিন্তু। অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলাম তোমার জন্য। বাড়িভাড়া আদায়ের এই সামান্য কাজটুকু—তা-ও কিন্তু থাকবে না। বাসা ছেড়ে দিয়ে এক্ষুনি দূর হয়ে যেতে হবে।

বিনয় তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না—অন্য-কিছু নয়। কাপড়খানা ছেঁড়া, জামাটাও ময়লা। আর ভাবছি, আমার বাবার কথা—তিনি বিয়ে দেখতে পাবেন না। বাবা ছাড়া আমার আপন কেউ নেই।

রঞ্জিত বলেন, টেলিগ্রাম করে দেবে। বিয়ে না দেখুন, বউভাতে এসে পড়বেন। মুর্শিদাবাদি গরদের জোড় কিনে কনের পিসির কাছে দিয়েছি—তোমার কপালে আছে, ছেঁড়া কাপড় ময়লা জামা ছেড়ে গরদের জোড় পরগে যাও। কে কিনল, আর কার ভোগে গিয়ে পৌঁছল!

অশ্বিনীর কাছে গিয়ে রঞ্জিত বলেন, ট্রেন ধরতে হবে, হাতে সময় নেই। কারবারি মানুষ, খোলাখুলি হিসাব আমার কাছে। কথাবার্তা যা হয়েছে, তার নড়চড় হবে না। তিন হাজারের মধ্যে যাবতীয় খরচ-খরচা বাদে এই ছাব্বিশ-শ' সাতান্ন টাকা ছয় পাই। টাকাটা দেখে নিন। এ টাকা আপনার। বাগানবাড়িতে যেমন আছেন থাকুন আপাতত, কেউ বাধা দেবে না। সমস্ত ঠিক আছে, বরটাই শুধু পালটে যাচ্ছে। আমি নই, বিনয়। তাতে বরঞ্চ

মুনাফাই আপনাদের। আধবুড়ো বরের জায়গায় ছোকরা বর পেয়ে যাচ্ছেন। আরও তো শুনলাম, পুরানো জানাশোনা—বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আগে থেকে চলছে।

আশিস ঘাড় নেড়ে বলে, আরও কিছু আছে মশায়। বিস্কুট-ফ্যাক্টরি বসাবেন এই বাগানে, সেই চেষ্টায় আছেন। সবাইকে চিরকাল কিছু থাকতে দেবেন না। আর পেটে না খেয়ে এতগুলো মানুষ থাকেই বা কী করে? শুধুমাত্র বাবার সঙ্গে ফয়শালা হলেই হবে না, ওদের ব্যবস্থা কি ভেবেছেন, বলুন।

রঞ্জিত বলেন, ফ্যাক্টরি হলে লোক লাগবে না? হাতের কাছে এঁরা থাকতে, বাইরে কেন লোক কুড়োতে যাব? এঁরাই থাকবেন সব। আর ছোট-বড় যেমনই হোক, কোয়ার্টারও কোম্পানি দেবে। মাইনে হল, বাসা হল—এর উপরে কি চাই, বল এবারে?

না, আর কিছু নয়। প্রসন্ন হয়ে আশিস বিয়ের যোগাড়ে গেল।

সদাশিব আনন্দে কি করবেন ভেবে পান না: কী বলছেন বড়বাবু, আমাদের বিনয়ই বর হল শেষ পর্যন্ত! আহা, বেঁচেবর্তে থাক ওরা, সর্বসুখী হোক। বিয়ের মন্তর তবে আমিই পড়াব। আজেবাজে পুরুতে কাজ নেই।

অশ্বিনীর তবু কেমন ইতস্তত ভাব। সদাশিব অধীর হয়ে বলেন, ভাবছ কি মেজরাজা?

অশ্বিনী বলেন, বাঁশিকে একটা বাড়ি লিখে দেবার কথা—সেটার কথা কিছু হল না?

রঞ্জিত চতুর্দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন। ইলু নীলু ও তাদের বান্ধবী মেয়ে চারটি মহোৎসাহে রান্না চাপিয়েছে, ইন্দ্রজিত কাঠকুটোর যোগাড় দিচ্ছে। ডেভিড সাহেবের কাজকর্ম সেরে মজুরটা এসে পড়ল; জাহ্নবী দেবী তলায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, লোকটা ফনফন করে নারকেল-গাছের মাথায় উঠে যাচ্ছে।

বশম্বদ বিনয়কে এদের মধ্যে আর দেখা যায় না, তাড়াতাড়ি বরের সাজ করছে কোন নেপথ্যস্থানে বসে। রুন্টু কোন দিক দিয়ে ছুটে এসে, বাবা-বাবা—করে দু-হাতে আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরল। বিপন্ন রঞ্জিত বলেন, আচ্ছা, হবে সেটাও। কলকাতার বাড়ি না হোক, এই দমদমে ছোটখাট একটা-কিছু করে দেব। বিনয় কাপড় বদলাতে গেছে। মন্তোর পড়তে লাগিয়ে দিয়ে আমি স্টেশনে রওনা হব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না মশায়। কথাবার্তা তো হয়ে গেল, কাজে লেগে যান। সময় বেশি নেই।

যে আজ্ঞে—বলে তৎক্ষণাৎ অশ্বিনী পাকাবাড়ির অভ্যন্তরে অদৃশ্য হলেন।

গরদের ধুতি গরদের চাদর গায়ে জড়িয়ে বিনয় এখন আলাদা মানুষ। বিয়ের বর। বর সেজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু সজ্জা দেখবার মানুষ কই? সংক্ষিপ্ত বিয়ে। নতুন পাড়ার মধ্যে যে ক'টি মেয়েলোক, বিয়েয় আসবেন তাঁরাই শুধু। বিয়ে না বিয়ে—চুক্তি মতো বরের নাম প্রকাশ করা হয়নি এতাবৎ, তেমন করে আসবার জন্যেও কাউকে বলা হয় নি। এইবারে আশিস যাচ্ছে, গিয়ে খবর দেবে, হুড়দাড় করে এসে পড়বেন সকলে। এখন প্রায়-নির্জন বিয়েবাড়ি।

বাঁশি হঠাৎ এসে পড়ে বিনয়ের সামনে। তাকিয়ে দেখে চোখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, বাঃ, দিব্যি দেখাচ্ছে তো!

বিনয় বলে, পুরো সাজ তবু হল কোথায়! বরের কপালে ফুটকি-ফুটকি চন্দন দিয়ে দেয়। তবে তো দেখাবে ভাল। অত সমস্ত কে করবে বল।

বাঁশি সকাতরে বলে, আয়না ধরে যা-হোক করে সেরে নাও। আমি পারব না। এক্ষুনি সব এসে পড়বে। কী বলবে দেখে!

বিনয়ও বুঝে দেখে সেটা : তা বটে, তোমার নিজেরও সাজসজ্জা আছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাওগে, গোধূলির বাকি বেশি নেই।

একেবারে কাছে এসে চাপা গলায় বিনয় বলে, এটা কি রকম হল, বল তো? কত বড় বড় সম্বন্ধ এল—বিদ্যেয় বড়, নামে-ডাকে টাকা-পয়সায় বড়, গায়ে-গতরে বড়—সমস্ত বাতিল হয়ে গিয়ে আমি? যে আমি সেই কোন কালে বাতিল হয়েছিলাম।

বাঁশি মুখ বাঁকিয়ে বিনয়ের স্বরের অনুকরণ করে বলে, কত বড় বড় ভারী ভারী সম্বন্ধ—কোনটার টাক মাথা, কোনটার অসুরের মতন চেহারা, কোনটা বাঘের মতন হালুমহলুম করে। উঃ, কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম! ভাগ্যিস তুমি কাছেপিঠে ছিলে।

কাছেপিঠে আজ কি আমায় নতুন পেলে বাঁশি?

বাঁশি গাঢ়স্বরে বলে, ঠিক তাই বিনয়-দা। তখন অট্টালিকার চূড়ায় থাকতাম, তোমরা খুপরিঘরে। ভাগ্যিস দেশভুঁই গেল—নতুন জায়গায় সকলে এবার একাকার।

বড় গম্ভীর কথাবার্তা। বেশিক্ষণ বাঁশি ভব্য হয়ে পারে না। ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, মন্দটা কি হল! অনেক রকমের বর দেখে নেওয়া গেল। স্বয়ম্বরা হলেন সোনাটিকারির রাজকন্যা। সত্যি বলি বিনয়-দা, ওগুলো বর নয়—এক-একটা বাঁদর। দূর, আমি যেন কী, বিনয়-দা বিনয়-দা করছি এখনো।